ঐতিহাসিক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

1 2
2 33
3 58
4 81

1

বোম্বাই শহর বড়মানুষের শহর। সেখানে পথে পথে নয়তলা দশতলা বাড়ি উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে; মালাবার হিল-এর প্রাসাদগুলি উচ্চ আসনে বসে আপন আপন গৌরব-গরিমা ঘোষণা করছে; আবার তারই আশেপাশে চৌল আছে, যেখানে হীনজীবী মানুষ খোপের পায়রার মত একটি কুঠরি নিয়ে বাস করছে; অন্ধ গলির মধ্যে বস্তির অধিবাসীরা নিজেদের উলঙ্গ দীনতা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

একটা স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। দরজার দুপাশে সুরকি-খসা দেয়ালের জরাজীর্ণ নগ্নতা, রং-চটা দরজার কাঠের ওপর কাঁচা হাতে খড়ি দিয়ে লেখা লোকনাথ সিংহ।

এই বাড়ির একটি ঘরে কেঠো তক্তপোশ ছাড়া আসবাব বলতে আর কিছু নেই। বালিশে পিঠ রেখে লোকনাথ বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে খক খক করে কাশছে। তার স্ত্রী কুসুম পিছন দিক থেকে স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে এমনভাবে তাকে ধরে আছে যাতে সে কাশির বেগ সামলাতে পারে। লোকনাথের বয়স আন্দাজ ছত্রিশ, শরীর রোগ-জীর্ণ, সারা দেহে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

কাশির বেগ একটু কমলে কুসুম স্বামীকে একগ্লাস জল এনে দিল, তার জল খাওয়া হলে আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। লোকনাথ শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে ক্ষীণস্বরে বলল–শুনেছি জলে ডুবে মরার আগে মানুষ অতীত জীবনের ঘটনা ছবির মত দেখতে পায়। আমিও যেন আজ ঠিক সেই রকম দেখতে পাচ্ছি

কুসুম ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল–ওগো অমন করে বোল না, চুপ কর।

তার কথায় কান না দিয়ে লোকনাথ আপন মনেই বলে চলল—ওই ছবিটা দেখলেই একটি দিনের কথা মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে সেদিন—

দেয়ালে একটি পুরানো ফটো— কম্পাউণ্ড-ঘেরা বড় বাড়ি, জমিদারের বাড়ি যেমন হয়, চারদিকে সুন্দর বাগান, বাগানের এক কোণে ফোয়ারা থেকে জল উৎসারিত হচ্ছে।

ফটোর দিকে চেয়ে লোকনাথ বলে চলেছে—ওই ফোয়ারা দেখছ, বাবার সঙ্গে সেদিন ওরই কাছে বসে দাবা খেলছিলাম। দাবা খেলায় বাবার কী ভীষণ নেশা ছিল—

স্মৃতির আলোয় দৃশ্যটি উজ্জীবিত হল। ফোয়ারার কাছে ছোট টেবিলের দুপাশে বসে পিতাপুত্রের দাবা-খেলা চলছে। দুজনেই খেলায় তন্ময়। বিশ বছরের যুবক লোকনাথ; একনাথের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চুলে পাক ধরেছে, মুখ দেখেই বোঝা যায় গর্বিত কঠোর প্রকৃতির মানুষ, খেলার সময়েও তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নরম হয় না। তিনি পরাজয়ে অভ্যস্ত নন।

কয়েকবার চাল দেবার পর লোকনাথ মুচকি হেসে দান দিল, সহজ সুরে বলল–কিস্তি। বাবা, আপনি মাৎ হয়ে গেলেন।

একনাথ ব্যগ্র বিস্ময়ে ছকের দিকে চেয়ে রইলেন। না, কোন সন্দেহ নেই, তিনি মাৎ হয়ে গেছেন। রাজার পালাবার রাস্তা নেই। তিনি বিড় বিড় করে বললেন—আরে তাই তো, এটা কি রকম হল। ছেলের দিকে ব্যর্থ চোখ তুলে তিনি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। ওহে ডাক্তার, এ কি কাণ্ড।

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার পাণ্ডে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, একনাথের আহ্বানে কাছে এসে দাঁড়ালেন। ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ, বুদ্ধিমান ও রসিক; বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ।

একনাথের গলায় গর্ব এবং নৈরাশ্য একসঙ্গে ফুটে উঠল–দ্যাখো ডাক্তার, কাণ্ডটা দ্যাখো। একটা কলেজের ছেলে কিনা আমায় মাৎ করে দিলে

লোকনাথ সসম্ভ্রমে উঠে নিজের চেয়ার ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, তিনি হাসতে হাসতে লোকনাথের পিঠে চাপড় মেরে বললেন—বাবুজি, আমাদের যৌবন ফুরিয়ে এল, এখন আমাদের হারের পালা। বিজ্ঞান বলে—

আরে রেখে দাও তোমার বিজ্ঞান। এ হচ্ছে বংশের ধারা। ছাকড়া গাড়ির ঘোড়া কি রেসের বাজি জিততে পারে।

ডাক্তার পাণ্ডে চেয়ারে বসে তর্ক জুড়লেন— তা হয়তো পারে না, কিন্তু রেসের ঘোড়ার কুলুজি ঘাঁটলে দেখা যাবে গোড়ার কেউ না কেউ ছ্যাকড়া গাড়িই টানত।

একনাথ হুঙ্কার দিলেন—অসম্ভব। হতেই পারে না। রেসের ঘোড়ার বাচ্চাই রেসের ঘোড়া হয়। লোকনাথ, ঠিক কি না?

লোকনাথ ঘাড় হেঁট করে রইল। একনাথ তখন বললেন-তুমি আজ প্রমাণ করেছ বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়। আমি খুশি হয়েছি। কি প্রাইজ চাই বল?

প্রাইজ! একটি প্রাইজের জন্যে তার মনে প্রবল লুব্ধতা ছিল, কিন্তু প্রবলপ্রতাপ বাপের সামনে সে কথা উচ্চারণ করার সাহস হয়নি। এখন প্রাইজের কথা শুনে তার মুখ অরুণাভ হয়ে উঠল, সে একবার বাপের দিকে একবার ডাক্তারের দিকে চাইতে চাইতে মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। শেষে দাবার ঘুঁটি নাড়াচাড়া করতে করতে জড়ানো গলায় বলল-প্রাইজ দেবেন? এঁ–

একনাথ সাহস দিয়ে বললেন–বল, লজ্জা কি। কী নেবে-আরবী ঘোড়া, না হাল ফ্যাশনের মোটরগাড়ি?

লোকনাথ আশান্বিত স্বরে বলল—যা চাইব তাই দেবেন?

একনাথ হাসলেন—যদি আমার সাধ্যে কুলোয়।

লোকনাথ তখন লজ্জা-গদগদ কণ্ঠে বলল—বাবা, একটি মেয়ে আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

নিমেষে একনাথের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি ভ্রূকুটি করে লোকনাথের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কড়া সুরে বললেন-মেয়ে? কার মেয়ে?

এখন আর পিছনো যায় না, লোকনাথ যথাসম্ভব ধীরভাবে বলল–স্কুল-মাস্টারের মেয়ে, লখনৌতে বাড়ি। আমাদের বোডিংয়ের কাছে বাসা ছিল।

একনাথ অবিশ্বাসের সুরে বললেন-স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?

লোকনাথ বলল— তাতে দোষ কি? ভিন্ জাতের মেয়ে তো নয়, ওরাও রাজপুত।

ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে একনাথ বললেন–তাহলেই হল? দ্যাখো হে ডাক্তার, আজকালকার ছেলেরা দুপাতা ইংরিজি পড়ে কি শিখেছে।

একগুঁয়েমির বংশগত গরম লোকনাথের মাথায় চড়তে আরম্ভ করেছিল, ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বলল— ইংরিজি পড়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ দেখতে পাচ্ছি না।

একনাথের দৃষ্টি আরো কঠিন হয়ে উঠল–চোখ থাকলে তো দেখবে। শোনো, আগে বংশের প্রতি কর্তব্য, তারপর অন্য কথা। স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না, সমান ঘরে বিয়ে করতে হবে। আমার কাছে বংশমর্যাদাই প্রধান।

কিন্তু

একনাথ গর্জন করে উঠলেন–ব্যস্, অনেক শুনেছি, আর না। আমি এ বাড়ির মালিক, আমার কথা সবাইকে মেনে চলতে হবে। আমি যার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির করব তাকেই বিয়ে করতে হবে। এই আমার শেষ কথা। হাতের এক ঝটকায় তিনি দাবার ঘুঁটিগুলো টেবিল থেকে নীচে ফেলে দিলেন, যেন এই ভাবেই উদ্যত বিদ্রোহকে ধূলিসাৎ করলেন।

লোকনাথ আর কোন কথা বলল না, কিন্তু তার মনের বিদ্রোহ মুখের ওপর প্রতিবিম্বিত হল। ডাক্তার পাণ্ডে এই পারিবারিক অগ্ন্যুদগারের সামনে পক্ষাহতের মত বসে রইলেন।

.

রোগপাণ্ডুর লোকনাথ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে কুসুমকে কাছে টেনে নিল, আপন মনে বলে চলল— আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না, শুধু জানতাম কুসুমকে না পেলে আমি বাঁচব না। কাউকে না জানিয়ে তাকে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে এলাম—

.

বরবধু বেশে লোকনাথ ও কুসুম বাগানের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে আসছে।

বাড়ির বারান্দায় একনাথ অগ্নিস্তম্ভের মত জ্বলছেন, মুহূর্তে একটা বিপর্যয় হতে পারে। চারিদিকে থমথমে ভাব। কিছু দূরে ডাক্তার পাণ্ডে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

বরবধু বারান্দার সিঁড়ির কাছে আসতেই একনাথ বজ্রের মত গর্জে উঠলেন— এত সাহস তোমার! ওই মেয়েকেই বিয়ে করেছ। তবে আমার কাছে এসেছ কেন? যাও, এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই নেই, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আজ থেকে তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র।

পাণ্ডে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন– বাবুসাহেব, এ আপনি কি করলেন। আপনার একমাত্র সন্তান

আমার সন্তান নেই। যাও, দুর হয়ে যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।

লোকনাথ স্থিরদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল–তাই যাচ্ছি বাবা। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি আপনি ডেকে না পাঠালে কোনদিন ফিরে আসব না।

জোড়হাতে নত হয়ে সে বাপকে প্রণাম করল, তারপর কুসুমের হাত ধরে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে চলে গেল।

বাড়ির ঝি-চাকরেরা এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখের জল মুছতে লাগল। বাড়ির পুরোহিতমশাই বারান্দার এক কোণ থেকে সব দেখছিলেন, তিনি আর্দ্র চোখে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। একনাথ পরিজনদের দিকে ফিরে উগ্রস্বরে বললেন— তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, আমার ছেলের সঙ্গে যদি কেউ সম্পর্ক রাখো, তাকেও দূর করে দেব। ওর নাম এ বাড়িতে কেউ উচ্চারণ করবে না।

.

লোকনাথ বিছানায় বসে আছে, কুসুম তার পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে অতীতের দুঃস্বপ্ন দেখছে।

লোকনাথ বলছে ...পনেরো বছর কেটে গেল, মনে হয় যেন সেদিনের কথা। এর মধ্যে কত ওলট-পালট হয়ে গেছে। সোমনাথ জন্মাল...বড় হয়ে উঠল...আর আমি দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি...অভাব...রোগ...আমার দিন ফুরিয়ে আসছে

ওগো চুপ কর।

তুমি যদি মনে কষ্ট পাও বলব না। কিন্তু মনকে তৈরি রাখাই ভাল। সোমনাথ কখন ফিরবে?

তার স্কুলের ছুটি হয় চারটেয়, আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। তাকে কোন দরকার আছে?

তার সঙ্গে এক দান দাবা খেলতাম...হয়তো আর খেলা হবে না। দাবার ছক আর ঘুঁটি এনে রাখ তো। বলতে বলতে দমকা কাশির বেগে সে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময় বাড়ির বাইরে নোংরা সরু গলি দিয়ে ডাক্তার পাণ্ডে চলেছিলেন। বয়সের ভারে তাঁর গতি মন্থর, হাতে একটি খোলা নোটবুক, বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যাচ্ছেন।

ঘরের মধ্যে তখন লোকনাথ বিছানার ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে

...ডাক্তার পাণ্ডে বলতেন, দাবা আর অহঙ্কার—এই দুটো আমাদের, মানে পুরন্দরপুরের সিংহদের আসল রোগ। ডাক্তার পাণ্ডেকে তুমি চেনো না, অতি সজ্জন, আমাদের বাড়ির ডাক্তার, তাঁকে চাচা বলে ডাকতাম। জানি না তিনি আছেন কিনা—

বাইরে ডাক্তার পাণ্ডে দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা নাম পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নোটবুকে নম্বর মিলিয়ে দরজার কাছে এসে বিষাদভরা বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন একটা জীর্ণ নোংরা বাড়িতে লোকনাথ থাকতে পারে। তিনি দরজায় টোকা দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁর পায়ের কাছে

একটি ঘুরন্ত লাট্টু এসে ঘুরতে লাগল। ডাক্তার পাণ্ডে ফিরে। দেখলেন একটি ছেলে, বয়স আন্দাজ চোদ্দ, বুদ্ধিতে জ্বল জ্বল করছে মুখ, পরনে প্যান্ট ও হাফশার্ট, কাঁধে বইয়ের ব্যাগ, হাতে লাট্টুর লেত্তি। লাট্টুর মালিক লাট্টু কুড়িয়ে নিয়ে সসম্ভ্রমে ডাক্তার পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করল— আপনি কাকে খুঁজছেন?

ডাক্তার পাণ্ডে সোমনাথকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে বললেন— লোকনাথ সিংহ কি এই বাড়িতে থাকেন?

সোমনাথ বলল–আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বাবার শরীর তো ভাল নেই।

ডাক্তার দুহাত বাড়িয়ে বললেন— তুমি লোকনাথের ছেলে! দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না।

তিনি সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক এই সময় কুসুম দরজা খুলে দেখল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সোমনাথকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলেছেন। সোমনাথ কোন মতে মুখ বার করে বলল–মা, ইনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সোমনাথকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার কুসুমের দিকে ফিরলেন। কুসুম তাঁকে এক নজরে দেখে চোখ নীচু করল, মৃদু স্বরে বলল— তাঁর শরীর খুব খারাপ, বাইরে আসতে পারবেন না।

ডাক্তার বললেন— শরীর খুব খারাপ! আচ্ছা, তাকে বলো ডাক্তার পাণ্ডে দেখা করতে চান। পনেরো বছর আগে সে আমাকে চাচাজি বলে ডাকত।

ঘরের ভেতর লোকনাথের কানে সব কথাই আসছিল, সে সানন্দে চিৎকার করে বলল— চাচাজি! আপনি এসেছেন! কুসুম, ওঁকে ঘরে নিয়ে এস।

কুসুম দোরের পাশে সরে দাঁড়াল, ডাক্তার পাণ্ডে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পেছনে সোমনাথ।

ঘরে প্রবেশ করে লোকনাথকে দেখেই ডাক্তার পাণ্ডে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রবীণ ডাক্তার এক লহমায় বুঝতে পারলেন লোকনাথের কাছে মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

বিছানার কিনারায় বসে ডাক্তার বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন— বাবা লোকনাথ, এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার! মুখ দেখে চেনা যায় না। কি– কী রোগ?

লোকনাথ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল— চাচাজি, আপনি ডাক্তার, নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন, আমার আর কত দিন।

ডাক্তারের চোখ জলে ভরে উঠল—এ কি–রাজরোগ?

লোকনাথ বলল–ঠিক ধরেছেন। একেবারে শেষ অবস্থা। দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হেসে বলল—এবারে কালো ঘুঁটির চাল। তিন চালে কিস্তিমাৎ।

কুসুম ছেলের পানে তাকাল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল— আয় তোকে খেতে দিই।

ওরা ঘর থেকে চলে গেলে ডাক্তার পাণ্ডে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন–গত পনেরো বছর ধরে কত জায়গায় না তোমাকে খুঁজেছি। কোথাও তোমার পাত্তা পেলাম না। হতাশ হয়ে খোঁজা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম, হঠাৎ সেদিন একজনের মুখে শুনলাম, বম্বে শহরের এই গলিতে তোমার নামে একজন থাকে। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু তোমার যে এই দশা দেখব তা কি ভেবেছিলাম।

লোকনাথ বলল–চাচাজি, দুঃখ করবেন না, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে। একটু থেমে বলল-বাবা কেমন আছেন?

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বললেন–তাঁর কথা আর কি বলব। তুমি চলে আসার পর মানুষটা একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছেন। মেজাজ সব সময় সপ্তমে চড়ে আছে। শরীরও আর আগের মত নেই, বাতের যন্ত্রণায় অধিকাংশ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। এই পনেরো বছরের মধ্যে তিনি পনেরো দিন নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছেন কিনা সন্দেহ। এখন আমি বলি কি, তুমি বাবা বাড়ি ফিরে চল।

একটু চুপ করে থেকে লোকনাথ বলল-বাবার কি তাই ইচ্ছে?

ডাক্তার পাণ্ডে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন– না, মুখ ফুটে কিছু বলেননি, তবে তাঁর মনের কথা তো জানি, তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। মনে মনে ছটফট করছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। জানো তো ওঁর স্বভাব, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না

মলিন মুখে লোকনাথ খানিক চুপ করে রইল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল– চাচাজি, আমার রক্তেও তো ওই একই অহংকার রয়েছে। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে আমি ফিরে যাব না। আমি যা করেছি তার জন্যে আমার তিলমাত্র লজ্জা নেই। আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন, আমার ছেলে সোমনাথকেও দেখলেন। ওদের জন্যে আমি লজ্জা পাব ভেবেছেন! কখনো না।

পাশের ঘরে সোমনাথ মেঝেয় পিঁড়িতে বসে একমনে জলখাবার খাচ্ছে; কুসুম তার পাশে বসে আছে, কিন্তু তার কান পড়ে আছে ও-ঘরের দিকে। লোকনাথের গলা শোনা যাচ্ছে আপনি ঠাট্টা করে আমাদের বংশের দুটি দোষের কথা বলতেন। (দাবার ছকের দিকে আঙুল দেখিয়ে) একটি তো এই। নিজেই বুঝতে পারি, না মরা পর্যন্ত আমার এ নেশা ঘুচবে না।-সোমনাথ!

পাশের ঘর থেকে সোমনাথ উত্তর দিল— যাই বাবা। মুখ মুছতে মুছতে সে কাছে এসে দাঁড়াল। লোকনাথ হাসিমুখে বলল—খেলার জন্যে তৈরি?

সোমনাথ সাগ্রহে বলল–হ্যাঁ বাবা।

দেখা যাক, কে হারে কে জেতে। হারলে আমার দুঃখ নেই, ছেলেরা চিরদিনই বুড়োদের হারিয়ে দেয়। চাচাজি, সংসারের এই নিয়ম, না? আপনাকে কিন্তু আম্পায়ার হতে হবে।

পাণ্ডে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লেন। খেলা শুরু হল। একাগ্র চোখে ছকের পানে তাকিয়ে দুজনে ঘুঁটি চালছে, পাণ্ডেও মন দিয়ে খেলা দেখছেন। পাশের ঘরে কুসুম মাঝে মাঝে দোরের কাছে এসে ওদের দেখছে, আবার সরে যাচ্ছে—

রাস্তা থেকে বৈরাগীর সুর শোনা গেল—

কাকো বন্দো কাকো নিন্দো
      দোনো পাল্লা ভারী।

.

পুরন্দরপুরের অর্ধ-নাগরিক পরিবেশের মধ্যে একনাথ সিংহের বাড়িটা যেন জরাহীন অমরত্বের জয়টীকা পরে দাঁড়িয়ে আছে। পনেরো বছরে তার তিলমাত্র ক্ষয়ব্যয় হয়নি।

সদর বারান্দার মাঝখান থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠেছে; দুপাশে কাঠের রেলিং দেওয়া সেকেলে ধরনের সিঁড়ি। দোতলায় সিঁড়ির মুখ থেকে লম্বা বারান্দা, তার একপাশে সারি-

সারি দরজা, অন্য পাশে খোলা আকাশ। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি বড় টেবিলের ওপর নানা রকমের ফল সাজানো রয়েছে, টেবিলের পিছনে একটি সেলফের ওপর কাচের বাটি গেলাস রাখা আছে। টেবিলের সামনের দিকে রুপোর প্লেটের ওপর এক গেলাস শরবত ঢাকা রয়েছে।

একনাথের খাস চাকর গোবর্ধন টেবিলের কাছে উবু হয়ে বসে আছে এবং সতর্কভাবে একটা দরজার পানে তাকিয়ে আছে। সকালবেলা একনাথের শয্যাত্যাগের সময় হয়েছে।

খাবারঘরের দরজা ঠেলে অল্পবয়সী একটি ঝি বারান্দায় বেরিয়ে এল, এক হাতে বালতি-ভর্তি এঁটো গেলাসবাটি, অন্য হাতে এঁটো থালা। গত রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন সে মাজতে নিয়ে যাচ্ছে। বালতির মধ্যে বাসনগুলো দাসীর পা ফেলার তালে তালে ঝন ঝন্ শব্দ করছে।

গোবর্ধন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আঙুল তুলে চাপা তর্জনের সুরে বলল— সসস। তোর কি হাঁটার কোন ছিরিছাঁদ নেই! পা ফেলছে দেখ না, যেন রাজসভায় নাচতে চলেছে! (একনাথের ভেজানো দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) কর্তার কানে যদি যায়, তোর মুণ্ডু কেটে গেণ্ডুয়া খেলবেন।

ঝিয়ের নাম তারা, সে পা টিপে টিপে গোবর্ধনের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল— কর্তাবাবুর মেজাজ আজ কেমন?

গোবর্ধন বলল— গোল করিস না। মেজাজ খুব খারাপ, সকাল থেকে ক্ষেপে আছেন। যে সামনে পড়বে তার আর রক্ষে নেই। যা, নিঃসাড়ে সরে পড়।

যাচ্ছি দাদা। আজ যে কপালে কি আছে ঠাকুর জানেন। তারা-ঝি বালতি এবং থালা সামলাতে সামলাতে সিঁড়ির পাশে চলল। যেতে যেতে পিছন ফিরে চাইতে লাগল। সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল, বাসনগুলো বিপুল ঝনৎকার তুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়াতে আরম্ভ করল। ভয় পেয়ে তারা-ঝি কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। গোবর্ধন শিউরে উঠে দুহাতে নিজের কান চেপে ধরল।

.

একনাথ সিংহের শয়নঘরটি লম্বায়-চওড়ায় বেশ প্রশস্ত। পুরানো ফ্যাশনের ভারী ভারী আসবাব, ঘরের মাঝখানে চাঁদোয়া দেওয়া প্রকাণ্ড খাট-পালঙ্ক। একনাথ খাটের ওপর কোল পেতে বসে আছেন; তাঁর কোলে রামচরিত মানস। তিনি মাঝে মাঝে দু-একটি দোঁহা গুন গুন শব্দে উচ্চারণ করছেন। পনেরো বছরে তাঁর চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, কেবল ঝাঁকড়া ভুরুতে পাক ধরেছে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল, তিনি ব্যঙ্গ-স্বরে বলে উঠলেন— পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে রাম বনে গিয়েছিলেন। মিথ্যে কথা— বাজে কথা! রাম বনে গিয়েছিলেন দশরথকে জব্দ করবার জন্যে।

কোল থেকে রামচরিত মানস তুলে তাচ্ছিল্যভরে তিনি পাশে ফেললেন, ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বার করে দেখেই উগ্রস্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন—গোবরা।

রুপপার থালার ওপর শরবতের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢুকল—এই যে শরবত।

একনাথ কটমট করে তার পানে তাকালেন— শরবত আনা হয়েছে? কটা বেজেছে তার হিসেব আছে?

আজ্ঞে সাতটা।

তাহলে আমি কখন দেওয়া হবে? তোমাকে রোজ মনে করিয়ে দেবার জন্যে কি আর একটা চাকর রাখতে হবে?

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর শরবত রেখে গোবর্ধন ছুটে গেল ঘরের কোণে একটি দেরাজের দিকে। দেরাজ খুলে একটি চাঁদির আফিমের কৌটো নিয়ে ছুটে এসে একনাথের সামনে দাঁড়াল। কৌটো খুলে একনাথ আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যবাণ ছুটল। গোবর্ধন আবার শরবত হাতে নিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

একনাথ আফিমের গুলি মুখে ফেললেন, শরবতের সাহায্যে সেটি গলাধঃকরণ করলেন, তারপর গেলাস ফেরত দিয়ে বললেন–ডাক্তার হতভাগা গেল কোথায়? কেউ তার খবর জানে?

গোবর্ধন আফিমের কৌটো যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল–আজ্ঞে তিনি তো পনেরো দিন ছুটি নিয়ে বাইরে গেছেন, আজ ফেরবার কথা।

একনাথ বললেন–আজ যদি না ফেরে ডাক্তারকে জবাব দেব। আমি বাতের যন্ত্রণায় মরছি, আর তিনি গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন। অমন ডাক্তারের দরকার নেই।

আজ্ঞে কর্তা।

যাও, তুমি বেরোও এখন।

গোবর্ধন ঝটিতে শরবতের গেলাস নিয়ে প্রস্থান করল।

বারান্দায় একজন চাকর ঝাঁট দিচ্ছিল, গোবর্ধন চোখ পাকিয়ে তাকে শাসন করল– কর্তাবাবু বাতের যন্ত্রণায় মরছেন, আর তুই ঝাঁট দিচ্ছিস? এত বড় আস্পর্ধা! যা তোকে জবাব দিলাম সে প্রভুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাল। ঝাড়ুদার ভৃত্যটিও রসিক ব্যক্তি, সে কপট বিনয়ের ভঙ্গিতে সেলাম করে ঝাড় বগলে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

গোবর্ধন তখন নিরিবিলি আর এক গেলাস শরবত তৈরি করে আত্মারামকে নিবেদন করবার উপক্রম করছে, নীচের দিকে নজর পড়ল, চারজন বেহারা একটি পালকি কাঁধে ফটক থেকে বাড়ির দিকে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে সেই দিকে চেয়ে রইল। তার মনে প্রশ্ন জাগল—পালকি করে কে আসে? এ বাড়িতে পালকির পাট তো অনেক দিন উঠে গেছে।

বারান্দার সামনে বেহারারা পালকি নামাল। পালকির দরজা খুলে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে লাফিয়ে বাইরে এল। তারপর আস্তে আস্তে পা বের করে বেরিয়ে এল একটি রোগা শুকনো চেহারার লোক; বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, শরীরের কাঠামো দেখে মনে হয় এককালে ভারী জোয়ান ছিল, কিন্তু এখন তার বুকে ও বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চোখ কোটরগত, গাল শুকিয়ে গেছে। লোকটি জমিদারবাবুর সর্দার লাঠিয়াল বসন্ত সিং, মেয়েটি তার কন্যা ললিতা।

বসন্ত সিংয়ের অবসন্ন শরীর নুয়ে পড়েছে, কোনমতে মেয়ের হাত ধরে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। সিঁড়ির মাথায় গোবর্ধন দাঁড়িয়ে ছিল, সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল—সর্দারজি, এই রোগা শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন? আপনার জখমের ঘা তো এখনো সারেনি।

বসন্ত সিং গম্ভীর মুখে বলল-মরার আগে এ ঘা আর সারবে না। মালিককে এত্তেলা দাও, তাঁর কাছে আর্জি আছে।

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল–কিন্তু সর্দার, মালিকের মেজাজ আজ খুবই খারাপ, সকালবেলা উঠেই আমার মাথাটি চিবিয়েছেন। আপনি এসময় তাঁর কাছে গেলে বরং আজ বিকেলবেলা।

অধীর স্বরে সর্দার বলল— আমার দেরি করার সময় নেই। তুমি যদি এত্তেলা না দাও, আমি বিনা হুকুমে মালিকের কাছে যাব।

সর্দার একনাথের খাস কামরার পানে পা বাড়াল।

গোবর্ধন ভয় পেয়ে বলল—না না, আমি খবর দিচ্ছি। এত্তেলা না দিয়ে গেলে কর্তা আমাকে খুন করবেন। সে আগে আগে চলল, মেয়ের হাত ধরে সর্দার তার পিছনে রইল।

একনাথ আগের মতই বিছানায় বসে আছেন, কিন্তু তাঁর বসার ভঙ্গিটা আরো উগ্র, যেন তাঁর মনের কটাহে চিন্তাগুলো টবগ করে ফুটছে। গোবর্ধনকে দেখে তিনি জ্বলে উঠলেন— আবার কী! কে তোকে ডেকেছে?

গোবর্ধন হাত কচলাতে কচলাতে বলল আজ্ঞে সর্দার বসন্ত সিং

একনাথ বললেন— তার আবার কি হল? মরে গেছে নাকি? :

দোরের কাছ থেকে বসন্ত সিং বলল— আজ্ঞে না, মরিনি এখনও, তবে বেশি দেরি নেই মালিক। সে সামনে এসে জোড়হাতে মাথা নোয়াল, তারপর হাঁটু মুড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। একনাথ কঠিন দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বললেন— তুই আবার কি মনে করে এসেছিস? ভাল লোককে সর্দার লেঠেলের পদ দিয়েছিলাম। কোথায় শত্তুরের হাড় গুঁড়ো করবে, তা নয়, নিজেই মার খেয়ে ফিরে এসেছে। অপদার্থ কোথাকার! যা, তোকে বরখাস্ত করলাম, তোর মত লেঠেল আমার দরকার নেই।

একনাথের রূঢ়বাক্যে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে বসন্ত সিং মেয়েকে কাছে টেনে নিল, বললমালিক, বিশ বছর আপনার গোলামী করছি, কাজে কখনো ফাঁকি দিইনি। খুন জখম যখন যা হুকুম করেছেন হুকুম তামিল করেছি, কখনও পিছপাও হইনি, বুকের রক্ত দিয়ে কাজ হাসিল করেছি। কিন্তু এবারের চোটটা আমায় শেষ করে দিয়েছে। আপনাকে আর বরখাস্ত করতে হবে না স্বয়ং যমরাজ নোটিশ দিয়েছেন। আমি শেষ পর্যন্ত মালিকের সেবা করতে পেরেছি, আমার কোন দুঃখ নেই

তবে হট্‌ করে আমার ঘরে ঢুকলি কেন? কি চাস তুই?

মালিক, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই মেয়েটা ছাড়া (ললিতা চোখ তুলে নিরীহভাবে বাপের পানে চাইল) আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, আজ থেকে আপনি ওকে পালন করবেন।

একনাথ আকাশ থেকে পড়লেন অ্যাঁ, আমি তোর মেয়েকে মানুষ করব? তিনি আবার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন–চালাকি পেয়েছিস! তোকে কুকুরে কামড়েছে রে হতভাগা। যা এই দণ্ডে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

বসন্ত সিং উঠে দোরের দিকে চলল— তাই যাচ্ছি মালিক, কিন্তু মেয়ে রইল। ওকে আপনার বাঁদী করে রাখবেন।

একনাথ চিৎকার করে উঠলেন— ওরে হতচ্ছাড়া, যাচ্ছিস কোথায়? মেয়েটাকে নিয়ে যা, ওকে আমি পুষতে পারব না। বাড়িতে একটা মেয়েছেলে নেই, কে ওকে দেখবে?

দোর পর্যন্ত গিয়ে সর্দার আস্তে আস্তে ফিরল, সে অব্যক্ত কণ্ঠে বলল–গোবর্ধন ভাই, একটু জল

গোবর্ধন এতক্ষণ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। একনাথ গর্জন ছাড়লেন— ঘরের কোণে জলের কুঁজো দেখতে পাচ্ছিস না, হতভাগা উল্লুক।

গোবর্ধন ছুটে গিয়ে সোরাই থেকে জল নিয়ে যখন সর্দারের কাছে এল, সর্দার ততক্ষণে এলিয়ে পড়েছে। গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গলা থেকে বেরিয়ে এল সেলাম মালিক।

গোবর্ধন তার মুখে জল ঢালবার চেষ্টা করল, কিন্তু জল মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। ললিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে বাবা বাবা বলে কেঁদে উঠল। ঠিক এইসময় ডাক্তার পাণ্ডে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ডাক্তার বসন্ত সিংকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, একনাথ বলে উঠলেন—দেখ তো ডাক্তার, মরে গেল নাকি!

ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে বসন্ত সিংয়ের নাড়ী টিপলেন, বুকে হাত দিয়ে দেখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চাইলেন— হাঁ, বুকের স্পন্দন থেমে গেছে ডাক্তারের মুখে তিক্ত কঠিনতা ফুটে উঠল, তিনি কেটে কেটে কথা বললেন–আর একটা দুঃসংবাদ আছে : আপনার একমাত্র ছেলে লোকনাথও মারা গেছে।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে নিস্তরঙ্গ নীরবতা নেমে এল।

.

আধঘণ্টা কেটে গেছে। বসন্ত সিংয়ের শব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, গোবর্ধন ললিতার হাত ধরে নিয়ে গেছে। এই আধঘণ্টার মধ্যে একনাথ ও ডাক্তার পাণ্ডে একটি কথারও বিনিময় করেননি, একনাথ নিশ্চল হয়ে চেয়ারের দিকে চেয়ে আছেন, ডাক্তারের অভিযোগ-ভরা দৃষ্টি একনাথের ওপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে একনাথ ডাক্তারের পানে আরক্ত চক্ষু তুললেন, বিকৃতস্বরে বললেন– লোকনাথ যদি মরে গিয়ে থাকে তাতে আমার কি! আমার কিছুই আসে যায় না।

ডাক্তার নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন-দারুণ অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সে মারা গেছে।

একনাথ ফেটে পড়বার উপক্রম করলেন এসব কথা তুমি আমাকে কেন শোনাচ্ছ? বলেছি তো লোকনাথ সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র আগ্রহ নেই।

ডাক্তারের গলা আরো ভারী হয়ে এল— জানি। সে যে আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলল, একথা আমি ভুলতে পারছি না। তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলে

একনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না, খাট থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে চিৎকার করে উঠলেন—-শুনতে চাই না—ওরা আমার কেউ নয়—হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার ফলে তাঁর পায়ে বাতের ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছিল, তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, ডাক্তার তাঁকে ধরে খাটের পাশে বসিয়ে দিলেন। একনাথ। দাঁতে দাঁত চেপে ডাক্তারের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সবাই বজ্জাত, সবাই দাগাবাজ। শয়তান। আমি চিনি না। তোমাদের সবাইকে চিনি। তোমার ফন্দি আমি বুঝেছি। তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলেকে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও।

ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লেন আমার কোন রকম ফন্দিফিকির নেই, থাকলেও কোন কাজে লাগত না। একটা কথা আপনি বোঝবার চেষ্টা করুন, আপনার নাতি বা আপনার

পুত্রবধু আপনাকে ভালবাসে না, আপনি যদি তাদের এ বাড়িতে আনতে চান, মনে হয় না তারা আসতে রাজী হবে।

ক্ষণকালের জন্য গুম হয়ে গিয়ে একনাথ প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের মত ফেটে পড়লেন— কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাড়িতে আসতে রাজী হবে না! চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে। আসব–ডাক্তারের সংশয়পূর্ণ মাথানাড়া দেখে তিনি দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন– আমার কথার ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কার! যাও তুমি, এখনি তাদের ধরে নিয়ে এস।

ডাক্তার দেখলেন ওষুধ ধরেছে, তিনি আরো দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন— বাবুজি, বম্বে শহরটা ঠিক পুরন্দরপুর নয়। সেখানে পুলিশ আছে, আইন-আদালত আছে। তাছাড়া আপনার নাতি আর পুত্রবধু তো মাটির পুতুল নয় যে তুলে নিয়ে আসব। তারা জলজ্যান্ত মানুষ, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে

স্বাধীন ইচ্ছা! আমার ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা, আমি এখন ওদের গার্জেন। যাও, এখনি আমার উকিলকে ডেকে আনো!

যে আজ্ঞে, যাচ্ছি— মুখে উদ্বেগ ও মনে সন্তোষ নিয়ে ডাক্তার প্রস্থান করলেন। একনাথ আপন মনে গজরাতে লাগলেন— আমার কথা অগ্রাহ্য করবে। দেখে নেব। এবার এমন শিক্ষা দেব যা জন্মে ভুলবে না।...

.

কয়েকদিন পরে।

সদর বারান্দার নিম্নতম ধাপের এককোণে বসে ললিতা আপন মনে পুতুল নিয়ে খেলছে, একটি পুতুলকে ফ্রক পরিয়ে কোলে শুইয়ে সুর করে ঘুমপাড়ানি ছড়া বলছে

সাতসমুদ্র পার থেকে
ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়ে
আসবে খুকুর বর—

ললিতা পুতুলকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন, তারপর সোমনাথ নামল, সব শেষে নামল কুসুম। তার বিধবার বেশ, মুখে ঘোমটা। ললিতা পুতুলখেলা থামিয়ে অবাক হয়ে তাদের পানে চেয়ে রইল।

পাণ্ডে আগে আগে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, সকলের পিছনে সোমনাথ। সে ললিতার পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে তার পুতুল খেলার আয়োজন দেখল, একটু নাক উঁচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ললিতা বিক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের বারান্দায় গোবর্ধন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে নীচু হয়ে কুসুমকে অভ্যর্থনা করল। তার মুখের ভাব গদ্গদ, সে ডাক্তারকে খাটো গলায় বলল–কর্তাবাবু ঘরেই আছেন, তাঁকে এত্তেলা দেব?

ডাক্তার বললেন— দরকার নেই, উনি জানেন।

গোবর্ধন কর্তার ঘরের পর্দা সরিয়ে একধারে দাঁড়াল, ডাক্তার কুসুমকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পুরনো ধরনের আরামকেদারায় একনাথ বসে আছেন, পরনে জমকালো পোশাক। ভুরু কুঁচকে তিনি গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন, ডাক্তারের গলা-খাঁকারি শুনে সেই দিকে তাকালেন। কুসুমের ওপর চোখ পড়তেই তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। পাণ্ডে কুসুমকে ইঙ্গিত করে এগিয়ে যেতে বললেন। কুসুম চোখ নীচু করে একনাথের পায়ের কাছে গেল, হাঁটু মুড়ে মাথা ঠেকিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করল। একনাথ একবার তার দিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কড়া সুরে বললেন–এই বাড়িতে তুমি থাকবে, আমার হুকুম। আমার সামনে কিন্তু কখনো আসবে না। যাও–অন্দরমহলে যাও। তিনি রাজকীয় ভঙ্গিতে অন্তঃপুরের দরজার দিকে আঙুল দেখালেন।

কুসুম মাথা নীচু করে সেই পথে চলে গেল। একনাথ তখন পাণ্ডের দিকে ফিরে বললেন—ছেলেটা কোথায়?

ডাক্তার চমকে উঠলেন—সোমনাথ? অ্যাঁ—কোথায় গেল! দেখছি। তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সোমনাথ নীচে ললিতার সঙ্গে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলছে, ললিতা সম্ভ্রমের সঙ্গে শুনছে। সোমনাথ লাত্তুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে বলল–পুতুলখেলা আবার খেলা! ও তো সবাই পারে। তুমি লাট্টু ঘোরাতে পার?

ললিতা হতাশ স্বরে বলল—না তো। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে?

সোমনাথ বলল—এ তুমি শিখতে পারবে না। ভারী শক্ত খেলা।

ললিতার মুখ দেখে মনে হল সে এখনি কেঁদে ফেলবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলল–আচ্ছা আচ্ছা, শেখাচ্ছি। এই নাও, লেত্তি আঙুলে জড়িয়ে এই এমনি করে ছুঁড়ে দাও।

ললিতা লাট্টু ছুঁড়ল, লাট্টু সোমনাথের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চোখ পাকিয়ে বলল— আর একটু হলেই আমার মাথাটা ফুটো করে দিয়েছিলে।

সে লাট্টু তুলে নিয়েছে এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে বললেন–তুমি এখানে কি করছ? চল চল, তোমার ডাক পড়েছে। তিনি ফিরে চললেন, সোমনাথ লাট্টু পকেটে রাখতে রাখতে তাঁর অনুগামী হল। ললিতা জলভরা চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের ঘরে সোমনাথ বৃদ্ধের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ভাবভঙ্গি নির্ভীক কিন্তু সন্ত্রমপূর্ণ। একনাথ তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইলেন, কিন্তু তাঁর চোখ বাষ্পচ্ছন্ন হল। নিজের দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন-তোমার নাম কি?

আমার নাম সোমনাথ, আমার বাবার নাম লোকনাথ সিংহ, আমার ঠাকুরদা পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।

একনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আত্মসংবরণ করলেন, শেষে বললেন— তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

সোমনাথ বলল— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি।

একনাথ হাত তুলে তাকে কাছে ডাকলেন, সোমনাথ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন–আমাকে চেন?

আজ্ঞে না। সে ডাক্তার পাণ্ডের দিকে তাকাতে তিনি ধীরস্বরে বললেন— ইনিই তোমার পিতামহ পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল— আপনি আমার দাদু? বাবার মুখে শুনেছি আপনি মস্ত বড়লোক, একজন রাজা। সত্যি আপনি রাজা?

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি ডাক্তারকে বললেন—একে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও ডাক্তার।

সোমনাথ চকিত হয়ে দুজনের মুখের পানে চাইল। ডাক্তার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন–চল সোমনাথ, তোমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।

.

অন্দরমহলে পূজার ঘর। গৃহদেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিগ্রহটি আকারে ছোট হলে কি হয়, প্রত্যহ খুব ঘটা করে তাঁর পূজা হয়।

পুরোহিতমশাই দেবীর সামনে স্তোত্রপাঠ করছেন, কুসুম জোড়হাতে তদগতভাবে দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে বসে আছে। দেবীর পদপ্রান্তে কয়েকটি পাত্রে রক্তজবা ফুল।

স্তোত্রপাঠ শেষ হলে বৃদ্ধ পুরোহিত ও কুসুম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর পুরোহিত কুসুমের দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন–মা, তুমি নিজের বাড়িতে এসে সংসারের ভার বুঝে নিয়েছ এ বড় আনন্দের কথা। গিন্নীমার মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, বাড়িতে এমন একজন মেয়ে নেই যে পূজার যোগাড়যন্ত্র করে। এতদিন পরে তুমি এসে সব ব্যবস্থা করেছ, দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এরপর দেখো, সব বিপদ-আপদ কেটে যাবে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে কুসুম বলল— ঠাকুরের দয়া।

2

সোমনাথের পড়ার ঘরে ফরাস-ঢাকা তক্তপোশের মাঝখানে বসে সে খাতার ওপর ঝুঁকে হাতের লেখা মক্স করছে। তক্তপোশের এক কোণে ললিতা বসে পুতুল খেলছে, কিন্তু পুতুলের চেয়ে সোমনাথের দিকেই তার মন পড়ে আছে বেশী। সে মাঝে মাঝে সোমনাথের পানে ঘাড় উঁচু করে চাইছে। একসময় সে বলল–কি লিখছ?

সোমনাথ মুখ না তুলে বলল-হাতের লেখা রপ্ত করছি।

ও। —নিজের নাম লিখতে পার?

সোমনাথ এবার মুখ তুলল—এত বোকার মত কথা বলতে পারে এই মেয়েটা ললিতা

তাড়াতাড়ি বলল— আচ্ছা, আচ্ছা, লিখতে পার! কিন্তু আমার নাম লিখতে পার কি?

খানিকক্ষণ চোখ পাকিয়ে থেকে সোমনাথ বলল—এদিকে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি লিখতে পারি কি না।

ললিতা এসে হুমড়ি খেয়ে বসল, সোমনাথ খাতায় লিখতে লিখতে বলল—ল-লি-তা। কেমন, লিখতে পারি?

ললিতা সন্দিগ্ধভাবে বলল—ঠিক লিখেছ তো?

ঠিক লিখেছি মানে? সোমনাথ হঠাৎ চোখ বড় করে বলল–অ্যাাঁ, তুই কি পড়তে জানিস না?

ললিতা বলল—না। কেউ তো আমায় শেখায়নি।

তাই নাকি! আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই শেখাব। আজ আমি তোর গুরু। বুঝলি? সোমনাথ ললিতার মাথায় হাল্কা একটা চাঁটি মারল।

এই সময় পাণ্ডে এলেন, সোমনাথকে প্রশ্ন করলেন—কী, কেমন আছ?

সোমনাথ বলল আজ্ঞে ভাল আছি। কিন্তু এই মেয়েটাকে কেউ লেখাপড়া শেখায় না কেন?

পাণ্ডে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন–কি জানো, তোমার দাদু মেয়েদের লেখাপড়া শেখা পছন্দ করেন না—

কিন্তু বোম্বাইয়ের সব মেয়েই তো স্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। আমি দাদুকে বলব।

না, তার দরকার নেই। তুমি যদি ললিতাকে লেখাপড়া শেখাতে চাও শেখাতে পার।

ডাক্তার চলে গেলেন।

সোমনাথ তখন ললিতার দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল— মন দিয়ে শোন্। আগে তোকে বর্ণপরিচয় শেখাব। এদিকে আয়।

ললিতা অনুগত ছাত্রীর মত তার সামনে এসে বসল— বলুন গুরুজি। সোমনাথ খাতায় বড় বড় অ লিখল, আঙুল দেখিয়ে বলল—এই হল—অ।

সামনে ঝুঁকে ললিতা অ দেখল, তারপর মুখ তুলে বলল— অ। —একে অ বলে কেন?

সোমনাথ বলল—কেন বলে সে খবরে তোমার দরকার নেই। বল— অ।

আচ্ছা-অ। এবারে চল ঘোড়া ঘোড়া খেলি।

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল—তোর মাথায় কি খেলা ছাড়া কিছুই ঢোকে না? চুপ করে বোস। বল—আ।

বড় করে আ লিখে আঙুল দিয়ে দেখাল। ললিতা বলল— আ। তুমি লাট্টু ঘোরাবে না?

গর্জন করে সোমনাথ বলল না। বল—আ।

নির্লিপ্তভাবে ললিতা বলল— আ। একে আ বলে কেন?

গুরুজির পক্ষে আর ধৈর্যরক্ষা করা সম্ভব হল না, তিনি ছাত্রীর গালে একটি চড় মারলেন। ছাত্রী ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

.

অন্তঃপুরের একটি ঘরে কুসুম মেঝেয় বসে প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে। তার সামনে অনেকগুলি রুপোর রেকাবি ও খাবারের ঝুড়ি। গোবর্ধন গেলাসে জল ভরছে। সে এখন বেশ আনন্দে আছে।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন কথা বলে চলেছে-বৌদিদি, কর্তাবাবুর এত অল্প রাগ অনেকদিন দেখিনি। সকাল থেকে আজ এখনো আমাকে একটি বার গালাগাল দেননি। গড়গড়ার নল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা শুধু বললেন, নল বদলে দে। অবাক কাণ্ড।

মুখে একটু হাসি নিয়ে কুসুম গোবর্ধনের গল্প শুনছিল, এখন একটি রেকাবি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল— এই নাও বাবার জলখাবার। সময়ের দিকে নজর রেখো। ঠিক সময়ে ঘরে নিয়ে যেও, এক মিনিট আগে নয় পরেও নয়। তুমি বরং খাবার নিয়ে

দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেই ঘড়িতে নটা বাজবে, অমনি ঘরে ঢুকবে। তাহলে তিনি রাগ করবেন না।

গোবর্ধন বলল— যা বলেছ বৌদিদি। তুমি যদি গোড়া থেকে এসে আমাকে সব কাজ শিখিয়ে দিতে, তাহলে কর্তাবাবু কোনদিনই আমার ওপর রাগ করতেন না।

এক হাতে জলখাবারের রেকাবি অন্য হাতে জলের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন চলে গেল। কুসুম সেই দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ওদিকে একনাথ নিজের বিছানায় অর্ধশয়ান হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাতের ব্যথায় হাঁটু ফুলেছে, হাঁটুতে ফ্ল্যানেলের পটি জড়ানো, হাঁটুর নীচে তাকিয়া।

কাগজ ফেলে দিয়ে তিনি ডাকলেন—গোবর্ধন! গলার স্বর তেমন রুক্ষ নয়।

কিন্তু গোবর্ধনের সাড়া নেই। ভুরু কুঁচকে তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। মেজাজ চড়তে শুরু করল। গাড়োলটা গেল কোথায়। তিনি আবার কড়া সুরে ডাকলেন—গোবর্ধন!

এবারও গোবর্ধনের দেখা নেই। রাগে ফুলতে ফুলতে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনরকমে গিয়ে আরামকেদারায় বসে পড়লেন—হতভাগা গাড়োলটাকে আজ দূর করে দেব।

এই সময় ঠং ঠং করে নটা বাজল। গোবর্ধন রেকাবি ও গেলাস হাতে প্রবেশ করল।

একনাথ বাঘের মত চোখ পাকিয়ে চাইলেন, তারপর গোবর্ধনের হাত থেকে গেলাস আর রেকাবি ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেয় আছাড় মারলেন—এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দিচ্ছিল রে হারামজাদা উল্লুক?

গোবর্ধন বলল–আজ্ঞে আমি তো দোরের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।

একনাথ এবার অবাক হলেন, তারপর খিচিয়ে উঠলেন— দাঁড়িয়ে ছিলি তো সাড়া দিচ্ছিলি না কেন?

গোবর্ধন বলল—আজ্ঞে বৌদিদি বললেন যে ঠিক নটা বাজলে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে।

রাগে দিশাহারা হয়ে একনাথ গর্জন ছাড়লেন-বেরিয়ে যা— দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেকুব কোথাকার! যাচ্ছিস?

গোবর্ধন আর দাঁড়াল না, একদৌড়ে কুসুমের কাছে উপস্থিত হল। কুসুমের খাবার সাজানো তখনো শেষ হয়নি, সে মুখ তুলল। গোবর্ধন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— সর্বনাশ হয়েছে বৌদিদি, কর্তাবাবু খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে যা নয়-তাই বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন?

সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আমি খাবার নিয়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, যেই ঠং ঠং করে নটা বাজল অমনি ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু কর্তা তখন চটে লাল

কুসুম বলল— বুঝেছি। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি বরং সোমনাথ আর ললিতাকে ডেকে আন। বাবার খাবার নিয়ে আমি যাচ্ছি।

গেলাস ও প্লেট তুলে নিয়ে কুসুম দৃঢ়পদে শ্বশুরের ঘরের দিকে চলল। গোবর্ধন শঙ্কিত মুখে চোখ গোল করে চেয়ে রইল। একনাথ কুসুমকে তাঁর সামনে যেতে বারণ করে দিয়েছেন, তবু সে যাচ্ছে। এইবার বুঝি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধল।

চেয়ারে বসে একনাথ আপন মনে তর্জন-গর্জন করছিলেন, কুসুম পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। সেই দিকে তাকিয়ে একনাথের বাচনিক বাহ্বাস্ফোট বন্ধ হয়ে গেল, তিনি স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে প্যাঁচার মত বসে রইলেন।

কুসুম তাঁর বাঁ-পাশে এসে চুপ করে দাঁড়াল। একনাথ প্রথমে তার দিকে তাকালেন না। তারপর আড়চোখে একবার খাবারের দিকে তাকালেন। কুসুম নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ একনাথ তিরিক্ষ সুরে বললেন—কি চাও?

কুসুম মৃদুকণ্ঠে বলল–খাবার এনেছি।

দরকার নেই।

কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ কিছুক্ষণ পরে আড়চোখে দেখলেন কুসুম যায়নি, বললেন—কথা কানে যায়নি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?

কুসুম নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। একনাথের মুখে আষাঢ়ে মেঘের অন্ধকার, চোয়াল বজ্রের মত কঠিন; এ অবস্থায় তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তিনি কুসুমের হাত থেকে প্লেট কেড়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। মুখ কিন্তু বজ্রগম্ভীর হয়ে রইল।

খাওয়া শেষ হলে কুসুম প্লেট নিয়ে গেলাস এগিয়ে ধরল। একনাথ গেলাসে চুমুক দিয়েছেন এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দৃশ্যটি দেখে ডাক্তারের মুখ ক্ষণেকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়েই আবার শান্ত নির্লিপ্ত ভাব ধারণ করল। তিনি এগিয়ে এলেন। একনাথ জলের গেলাস কুসুমকে ফেরত দিয়ে ডাক্তারের প্রতি ভীষণ ভ্রূকুটি করে বললেন-তোমার আবার কি দরকার?

কুসুম গেলাস ও রেকাবি নিয়ে চলে গেল, দোরের কাছ থেকে একবার ফিরে তাকাল। ডাক্তার হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন–কিছু না বাবুসাহেব, রোজের হাজিরা দিতে এসেছি। পায়ের ব্যথাটা কেমন?

একনাথ বললেন–সেকথা বলে লাভ কি? রোগই যখন সারাতে পার না তখন রোজ এসে জেরা করার কি দরকার?

ডাক্তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন–চেয়ারে বসলে দেখছি আপনার যন্ত্রণাটা কম থাকে। ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছেন তো?

একনাথ বললেন–তোমার ওষুধ খেলে ছাই হয়। ও ওষুধ আমি গোবর্ধনকে খাওয়াচ্ছি, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি যদি একটু খোলে।

পাণ্ডে সজোরে হেসে উঠলেন। একনাথের ভ্রূকুটি আবার গভীর হল— এতে হাসির কী আছে? তোমার ওই রদ্দি ওষুধ আমার দরকার নেই, তোমার রোজ রোজ এসে খোঁজ-খবর নেবারও দেরকার নেই। তোমার ডাক্তারি বাদ দিয়েও আমি ভাল থাকতে পারি।

সে তো খুবই ভাল কথা, আমিও তাই চাই। এখানে আসতে না হলে অন্য রোগীগুলোর দিকে নজর দিতে পারি। প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় ডাক্তার, বাবুসাহেব। আচ্ছা চলি। ডাক্তার পিছু ফিরলেন।

একনাথের গলা থেকে শব্দ বার হল–হুম।

.

বাগানে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে, পনেরো বছর পরে ফোয়ারা থেকে আবার জল উৎসারিত হচ্ছে। সকালবেলা বাগানের এক পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ললিতা কোঁচড়ে একরাশ ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। ফুচ-সুতোর সাহায্যে মালাটি প্রায় দুই হাত লম্বা হয়েছে।

পিছন দিক থেকে সোমনাথ হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে আসছে। ললিতার পাশে এসে সে ঘোড়ার মত চিহি চিহি শব্দ করে বলল-ঘোড়া হাজির।

ললিতা আহ্লাদে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, কোঁচড়ের ফুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ললিতা সোমনাথের পিঠে চড়ে বসল, ফুলের মালা লাগামের মত তার মুখে পরিয়ে দিয়ে মুখে টক টক শব্দ করে বলল–আগে বঢ়ো—আগে বঢ়ো

হামা দিতে দিতে সোমনাথ বলল—সওয়ারী যাবে কোন দিকে?

ললিতা বলল—সওয়ারী যাবে ফোয়ারার দিকে। তার তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবে। টক টক।

ঘোড়ার মত অঙ্গভঙ্গি করে চিহি চিহি শব্দ করতে করতে সোমনাথ ফোয়ারার দিকে চলল।

ফোয়ারার চারিদিকে গোল করে সিমেন্ট বাঁধান, চৌবাচ্চায় লাল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘোড়া ও আরোহিণী পাশাপাশি হাঁটু মুড়ে বসে আঁজলাভরে জল তুলে মুখে দিল, তারপর সিমেন্টের ওপর বসে গল্প করল। সোমনাথ বলল–আমার পকেটে একটা জিনিস আছে।

ললিতা সাগ্রহে প্রশ্ন করল— কি জিনিস ভাই?

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল–আবার! গুরুজি বলতে পার না।

ললিতা শুধরে নিয়ে বলল— কি জিনিস গুরুজি?

ভারিক্তি চালে সোমনাথ পকেট থেকে একটি দেশলাইয়ের বাক্স বার করল এতে কী আছে জান?

কি আছে, দেশলাইয়ের কাঠি?

না— আরশোলা।

ললিতা অমনি কুঁকড়ে গেল। সোমনাথ বলল—এটাকে পুষব ভাবছি।

ললিতা বলল–আরশোলা কেউ পোষে নাকি?

পুষলেই হল। লোকে কুকুর পোষে, পাখি পোযে, আরশোলা পুষলে দোষ কি?

আরশোলা ঘেউ ঘেউ করে ডাকবে? বুলবুলের মত গান গাইবে?

বলতে পারি না, হয়তো শেখালে শিখবে। বাক্সটি সন্তর্পণে একটু খুলে সোমনাথ ভেতরে উঁকি মারল—দ্যাখো কেমন গোঁফ নাড়ছে।

দুজনে মাথা ঠেকাঠেকি করে দেখতে লাগল। ললিতা বলল— মনে হচ্ছে ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দিলে হয়।

সোমনাথ বলল–দূর বোকা! আরশোলা কি জল খায়! ওরা তেল খায়।

দূর থেকে গোবর্ধনের গলা শোনা গেল—এখানে তোমাদের কী হচ্ছে?

সে কাছে এসে দাঁড়াতেই সোমনাথ বলল-গোবর-দা, কী সুন্দর একটা আরশোলা?

গোবর্ধন অমনি পশ্চাৎপদ হল— অ্যাঁ— আরশোলা! ফেলে দাও—ফেলে দাও। আরশোলা ভারি পাজি জন্তু-ওটাকে জলে ফেলে দাও

সোমনাথ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— তুমি বুঝি আরশোলাকে ভয় কর?

গোবর্ধন আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল–ভয় আমি কাউকে করি না কিন্তু দেশলাইয়ের বাক্স হাতে সোমনাথ এগিয়ে আসছে দেখে সে আবার পিছু হটতে লাগল—এ আবার কি...এরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না...আরশোলা দুচক্ষে দেখতে পারি না দেখলেই গা সিরসির করে—ছোটবাবু, ভাল হবে না বলছি। চকিতে পিছন ফিরে গোবর্ধন দৌড় মারল। সোমনাথ ও ললিতা হাসতে হাসতে তার পিছনে ছুটল।

.

অন্তঃপুরের একটি ঘরে মেঝের ওপর একটি আসনে বসে ডাক্তার পাণ্ডে আহার করছেন, হাত-পাখা নিয়ে তাঁর সামনে বসে কুসুম খাওয়া তদারক করছে।

খেতে খেতে পাণ্ডে কথা বলছেন—এই দুমাসেই বাবুসাহেব অনেক বদলে গেছেন।

কুসুম চোখ নীচু করে বলল-সে আপনি ভাল বলতে পারেন।

পাণ্ডে বললেন— হ্যাঁ মা, বোঝা যায়। এখন ওঁকে দেখে বেশ প্রফুল্ল মনে হয়, শরীর অনেক ভাল হয়েছে। মা, ওষুধপত্র কিছু নয়; আসল হল মন, মন-মেজাজ ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। গত পনেরো বছর বাবুসাহেবের মুখে হাসি দেখিনি; আশা হচ্ছে শিগগিরই ওঁর হাসিমুখ দেখতে পাব।

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কুসুম বলল— মা চণ্ডী তাই করুন।

.

একনাথ নিজের ঘরে মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—গোবর্ধন।

গোবর্ধনের দেখা নেই। একনাথ কিছুক্ষণ দোরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মেঝেয় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কতকটা আত্মগতভাবেই বললেন—কোথাও আড্ডায় বসেছে হতভাগা! নাঃ, ওকে দিয়ে আর চলবে না।

তাঁর আফিমের সময় হয়েছে। তিনি নিজেই গিয়ে দেরাজ খুলে আফিমের কৌটোটি তুলে নিলেন। দেরাজে আরো অনেক টুকিটাকি জিনিস রয়েছে, অনেকদিন তিনি নিজের হাতে দেরাজ খোলেননি, আজ ওইগুলির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সবই ধুলোয় ঢাকা পুরানো জিনিস, তার মধ্যে দাঁবার ছক ও ঘুঁটির বাক্স রয়েছে। একটু দ্বিধা করে তিনি সে দুটি

বার করলেন, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে স্নেহের ভঙ্গিতে তাদের গায়ে হাত বুলোত লাগলেন। অজ্ঞাতসারে একটা চাপা নিশ্বাস পড়ল।

হঠাৎ বন্ধ জানলার খড়খড়ি দিয়ে নীচে থেকে একটা হল্লার আওয়াজ এল। একনাথ ভ্রূকুটি করলেন, দাবার ছক ও ঘুঁটি নামিয়ে রেখে জানলার কাছে গেলেন, জানলার পাল্লা খুলে নীচের দিকে তাকালেন।

জানলার ঠিক নীচে বাগানের এক কোণে সোমনাথ ও ললিতা গোবর্ধনের সঙ্গে কানামাছি খেলছে। বাড়ির অন্য ঝি-চাকর—তাদের মধ্যে তারা-ঝিও আছে—পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। গোবর্ধনের চোখে ঝাড়ন বাঁধা, সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আর ললিতা ও সোমনাথ তার মাথায় চাঁটি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। গোবর্ধন তাদের ধরতে পারছে না। খেলা বেশ জমে উঠেছে। ঝি-চাকরেরা খেলা দেখতে দেখতে উচু গলায় হেসে উঠছে।

জানলা থেকে অলক্ষিতে একনাথ এই দৃশ্য দেখছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

এই সময় সোমনাথ পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটি নিয়ে পা টিপে টিপে গোবর্ধনের পিছন দিকে গেল, আরশোলা বার করে তার ফতুয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল। গোবর্ধন চিড়িক মেরে উঠল—ওরে বাবা, এটা কি রে! পিঠের ওপর সড় সড় করছে

সোমনাথ খিলখিল করে হেসে বলল-গোবর-দা, চিনতে পারলে না? আর-শো-লা।

নিমেষে চোখের বাঁধন খুলে ফেলে গোবর্ধন লাফালাফি আর চিৎকার করতে লাগল— ওরে বাবা রে, গেছি রে— এই যে কাঁধের ওপর—আরে, পেট খামচাচ্ছে—

জানলায় দাঁড়িয়ে একনাথ মৃদু মৃদু হাসছেন। পনেরো বছর পরে প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

নীচে থেকেও যৌথ হাসির কলধ্বনি আসছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একনাথ হাঁক দিলেন গোবর্ধন।

সকলের চোখ একসঙ্গে জানলার পানে উঠল। তারপর চক্ষের পলকে দাস-দাসীরা অন্তর্হিত হল। ললিতা ও সোমনাথ জানলার দিকে চেয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। গোবর্ধন ভব্যিযুক্ত হয়ে বলল আজ্ঞে যাই বাবু।

জানলা থেকে সরে এসে একনাথ বিছানায় বসে আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন, তাঁর মুখে হাসি হাসি ভাব লেগে রইল।

গোবর্ধন এসে মনিবের সামনে দাঁড়াল। তার গা-ভরা অস্বস্তি, মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিচ্ছে। আরশোলাটা বোধহয় এখনো তার জামার মধ্যে আছে।

একনাথ কড়া চোখে তার পানে তাকিয়ে বললেন–কি হয়েছে? অমন চিড়িক মারছিস কেন?

গোবর্ধন বলল— আজ্ঞে না, ও কিছু নয়।

কিছু নয় তো চুপ করে দাঁড়া।

হঠাৎ গোবর্ধন পেটের জামা মুঠোতে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—ধরেছি ব্যাটাকে ধরেছি। বলেই কর্তার দিকে চেয়ে থেমে গেল।

কর্তা বললেন—কী ধরেছিস? তোর পেটে কী হয়েছে? পেট কামড়াচ্ছে?

গোবর্ধন তখন কাতর স্বরে বলল–আজ্ঞে না বাবু, পেট কামড়াচ্ছে না। একটা আরশোলা– ছোটবাবু জামার মধ্যে আরশোলা ছেড়ে দিয়েছেন।

হাসি চাপার চেষ্টায় একনাথের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—তুই নিজে একটা আরশোলা। জল দে, আফিম খাব।

গোবর্ধন সোরাই থেকে জল ঢেলে আনল, একনাথ আফিমের গুলি মুখে দিয়ে জল খেলেন। গোবর্ধন সোরাইয়ের মুখে গেলাস চাপা দিয়েছে এমন সময় আবার আরশোলা তার বগলে সড় সড় করে উঠল; সে বগল চেপে ধরে একটা অর্ধোচ্চারিত চিকুর ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার একনাথের গলার মধ্যে হাসির মত একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল।

সোমনাথ ঘরে ঢুকল; একনাথ অমনি গম্ভীর হলেন। সোমনাথ বলল— দাদু, গোবর-দার নাচ দেখলেন?

একনাথ গম্ভীর মুখে বললেন— ওর পেছনে লেগেছ কেন? আরশোলা নিয়ে এ কি খেলা! কোথায় পেলে আরশোলা?

সোমনাথ উৎসাহ ভরে বলল— নীচে ভাঁড়ার ঘরে কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে অনেক আরশোলা আছে দাদু। দেরাজের দিকে যেতে যেতে—এটা অনেক পুরানো দেরাজ, এর মধ্যেও আরশোলা আছে।

দেরাজের ওপর দাদার ছক ও ঘুঁটি দেখে সে অবাক দৃষ্টিতে একনাথের পানে চাইল, ঘুঁটির কৌটো হাতে নিয়ে বলল—দাদু, আপনি দাবা খেলতে জানেন?

হাস্যকর প্রশ্ন। একনাথ বললেন— ফাজিল ছেলে! তুমি জান?

সোমনাথ বলল–জানি। বাবা শিখিয়েছিলেন।

একনাথের চোখের ওপর বাষ্পচ্ছায়া পড়ল, তিনি নিশ্বাস চেপে বললেন—তোমার বাবাকে আমি শিখিয়েছিলাম।

সোমনাথ ছক আর ঘুঁটির কৌটো নিয়ে একনাথের পাশে এসে দাঁড়াল—আমার সঙ্গে এক দান খেলবেন দাদু?

আয়ত চোখে চেয়ে থেকে একনাথ বললেন–তুমি খেলবে আমার সঙ্গে! তোমার সাহস তো কম নয়। আমি চোখ বুজে খেললেও তুমি হেরে যাবে।

সোমনাথ উত্তেজিত হয়ে বলল— কখখনো না, আপনি আমাকে হারাতে পারবেন না। বাজি রাখুন, আমি যদি আপনাকে হারিয়ে দিই কী দেবেন বলুন?

একনাথ ক্ষণেকের জন্যে চোখ বুজলেন, লোকনাথের সঙ্গে শেষ দাবা খেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি চোখ খুলে বললেন— কী নেবে তুমি?

একটা টাট্টুঘোড়া।

বেশ, তাই হবে। আর তুমি যদি হেরে যাও আমাকে কী দেবে?

সোমনাথ ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর পকেট থেকে লাট্টু বের করে বলল–এই লাট্টু আপনাকে দেব।

সোমনাথের সীরিয়াস মুখের দিকে চেয়ে একনাথের ঠোঁটের কোণ নড়ে উঠল, তিনি বললেন— টাট্টুর বদলে লাট্টু! বেশ, বাজি রইল। —বোর্ড লাগাও।

সোমনাথ মহানন্দে টেবিলের ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাতে লাগল। প্রশ্ন করল— কোন ঘুঁটি আপনি নেবেন? সাদা না কালো?

বিছানা থেকে নামতে নামতে একনাথ বললেন–কালো—আমি চিরদিন কালো ঘুটি নিয়ে খেলি।

তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে টেবিলের সামনে বসলেন; ছকের ওপর ঘুঁটির অবস্থান পরিদর্শন করে বললেন–ঠিক আছে। তুমি আরম্ভ কর।

সোমনাথ মন্ত্রীর ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিয়ে একনাথের মুখের পানে চাইল। একনাথ রাজার ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিলেন। সাদা কালো দুই বোড়ে মুখোমুখি বসল। খেলার লড়াই শুরু হয়ে গেল।

.

অন্তঃপুরের উঠোনে কুসুম পায়রাদের গম খাওয়াচ্ছে। কোঁচড় থেকে গম নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিচ্ছে, একঝাঁক পায়রা গুঁতোগুতি করে তাই খাচ্ছে।

পুরোহিতমশাই পুজোর ঘরে স্তব পাঠ করছেন। গোবর্ধনের সংহত গলা শোনা গেল-বৌদিদি–

কুসুম ফিরে চাইল। গোবর্ধন চোখ বড় বড় করে কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ দেখে মনে হয় ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে। কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল—কী হয়েছে গোবর্ধন?

মাথা নেড়ে গোবর্ধন বলল— তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না বৌদিদি, আমি নিজের চোখে দেখেছি তা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না

কুসুমের আতঙ্ক বাড়ছে-সোমনাথ কোথায়?

আহা, সেই কথাই তো বলছি বৌদিদি

ব্যাকুল স্বরে কুসুম বলল–শিগগির বল–সোমনাথ কোথায়?

কর্তাবাবুর সঙ্গে দাবা খেলছে। ভগবানের কী লীলা! স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি দাদা আর নাতি মুখোমুখি বসে দাবা খেলছেন। এ বাড়িতে আগে যেমন হত ঠিক তেমনি। পুরানো আমলে কি আবার ফিরে এল বৌদিদি?

কুসুমের চোখে জল এসে পড়ল, সে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

.

ওদিকে দাদা-নাতি দাবা খেলায় মগ্ন। সোমনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে আছে, চোখে একাগ্র তন্ময়তা। একনাথ মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছেন; তাঁর মনে বিভ্রম জাগছে–এ কি সোমনাথ, লোকনাথ?

লোকনাথই চাল দিচ্ছে, তারপর সোমনাথের গলার আওয়াজ আসছে—দাদু, এবার আপনার চাল।

আচ্ছন্নের মত একনাথ চাল দিচ্ছেন। মাথার মধ্যে ঘুরছে লোকনাথ–সোমনাথ—আমার ছেলে–আমার নাতি লোকনাথ যেন ছেলেকে আমার কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে; নিজে এল না, বড় অভিমানী ছিল

জলখাবারের দুটি রেকাবি হাতে নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল। পিছনে গোবর্ধন। সে কুসুমের দিকে চোখ বেঁকিয়ে চাইল; যেন বলল—দেখলে? কী বলেছিলাম!

কুসুম ইশারা করল, গোবর্ধন একটি ছোট টিপাই এনে খেলার টেবিলের পাশে রাখল। কুসুম রেকাবি দুটি টিপাইয়ের ওপর রেখে খেলোয়াড়দের দিকে চাইল, কিন্তু খেলোয়াড়দের কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। কুসুমের মুখ শান্ত, সে অনুচ্চ স্বরে বলল-বাবা, আপনার জলখাবার।

একনাথ মুখ না তুলেই বললেন—বাইরে অপেক্ষা করতে বল, এখন আমি ব্যস্ত আছি।

কুসুম ও গোবর্ধন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর কুসুম একটু গলা চড়িয়ে বলল–আপনার খাবার এনেছি বাবা।

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন–তাকে কাল আসতে বল, আজ আমার সময় নেই। এক ঘর গজ এগিয়ে দিয়ে বিজয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন-কিস্তি।

সোমনাথ একটু বিপদে পড়েছে; চারিদিকে শত্রু। কিন্তু পরিত্রাণের রাস্তা এখনো খোলা আছে। সে গজের মুখ থেকে রাজাকে সরিয়ে নিয়ে একনাথের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসল— অর্থাৎ কী এমন কিস্তি দিয়েছ।

এই সময় ডাক্তার পাণ্ডে বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। দাদা ও নাতি দাবা খেলায় মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশুন্য। কুসুমের পানে চেয়ে তাঁর মুখ হাসিতে ভরে উঠল, তিনি ভ্রূ তুলে নীরব প্রশ্ন করলেন— কাণ্ডটা কী?

কুসুম মৃদু হেসে খেলোয়াড়দের পানে চেয়ে রইল। ডাক্তার এসে একনাথের পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরে গেল। সোমনাথ নিজের মন্ত্রীকে কোণাকুণি দুঘর এগিয়ে দিয়ে বলল–কিস্তি।

একনাথ চমকিত হয়ে নিজের রাজা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না; আরো দু চাল পরে সোমনাথের মন্ত্রী একনাথের রাজার সামনে চেপে বসল, সোমনাথ বলল–কিস্তি মাৎ।

অত্যন্ত বিপন্নভাবে একনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সত্যিই তিনি মাৎ হয়ে গেছেন, আর রাজা নিয়ে পালাবার রাস্তা নেই। ওদিকে সোমনাথ নাচতে শুরু করেছে, নাচছে আর বলছে দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি, দাদু মাং হয়ে গেছেন—

একনাথের মুখে কথা নেই, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে ছকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুসুম ঠোঁটের ওপর আঁচল চাপা দিয়েছে, গোবর্ধন দন্ত-বিকশিত করে মাথা চুলকোচ্ছে। ডাক্তার হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলেন।

সোমনাথ তখনো নাচছে দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি মা তুমি সাক্ষী, ডাক্তারবাবু সাক্ষী–দাদু, আমাকে ঘোড়া দিন। সে একনাথের সামনে হাত পাতল।

একনাথ মুখ তুলে বোকার মত বললেন-ঘোড়া!

হ্যাঁ। বাজি রেখেছিলেন হেরে গেলে টাট্টুঘোড়া দেবেন। সে টপ করে খাবারের প্লেট তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

একনাথ লজ্জিতভাবে ছক থেকে সোমনাথের পানে চাইলেন। বিড় বিড় করে বললেন—অনেকদিন খেলিনি...দুধের ছেলের কাছে হেরে গেলাম

সোমনাথ খেতে খেতে বলল-দাদু, আমার ঘোড়া?

দেব রে বাপু, দেব। কিন্তু কাল আবার খেলা বসবে, তোকে গজচক্র অশ্বচক্র করে ছেড়ে দেব

তিনি খাবারের প্লেট তুলে নিলেন। তাঁর মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলতে লাগল, মৃদু হাসি ক্রমে বাড়তে লাগল, শেষে একেবারে হো হো করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। যেন বহুকালের রুদ্ধ উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গিয়ে জলের উচ্ছাস চারিদিকে উৎসারিত হল।

বাষ্পচ্ছন্ন চোখে কুসুম তাঁর পানে চেয়ে রইল। ডাক্তারের চোখও আর্দ্র হল, তিনি জানলার সামনে গিয়ে দাড়ালেন।

3

সোমনাথের ঘোড়া কেনা হয়েছে, দুধের মত সাদা টাট্টুঘোড়া। সহিসের ব্যবস্থাও হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে মুখের লাগাম ধরে সহিস দাঁড়িয়ে আছে, আর যোধপুরী ব্রিচেস পরে চাবুক হাতে নিয়ে সোমনাথ ঘোড়ায় চড়বার চেষ্টা করছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়া কিন্তু সহজ কাজ নয়, তা হোক না সে টাট্টুঘোড়া।

যতবারই সোমনাথ ঘোড়ার পাশে গিয়ে লাফ মেরে পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে, ততবারই সে সরে সরে যাচ্ছে। বাড়ির কয়েকজন গোমস্তা ও চাকর দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় চড়া দেখছে ও নানা রকম মন্তব্য করছে।

গোবর্ধন বলল–ঘোড়াটা দেখছি ভারি দুষ্টু। ছোটবাবু, আমি বরং তোমাকে কোলে করে ওর পিঠে তুলে দিই।

না, আমি নিজেই চড়ব। সোমনাথ আবার লাফ দিল, কিন্তু ঘোড়া আবার সরে গেল।

একজন গোমস্তা বুদ্ধি দিল—একটা টুল আনলে ভাল হয়, টুলে চড়ে সহজে ওঠা যাবে।

দ্বিতীয় গোমস্তা বলল-ছোটবাবুর হাতের চাবুক দেখেই ঘোড়া ভয় পাচ্ছে। ওটা ফেলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

সোমনাথ রাগ করে বলল—তোমাদের আর বুদ্ধি দিতে হবে না, আমি যেমন করে পারি উঠব।

গোবর্ধন বলল–আমি বলি কি, ঘোড়ার পাগুলো চেপে ধরলে হয় না?

গোমস্তা বলল-ঘোড়ার পায়ে ধরতে চাও তুমিই ধর না বাপু।

সকলে হেসে উঠল।

দোতলায় নিজের জানলা থেকে একনাথ সব দেখছেন আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। যত সব অপদার্থ। একটা ছেলেকে ঘোড়ায় চড়াতে পারে না।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন— দাঁড়া সোমনাথ, আমি আসছি—

তিনি বকতে বকতে দোরের দিকে চললেন।

নীচের বারান্দায় ললিতা একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে দোল খাচ্ছিল, একনাথ সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন; পা ঠিক পড়ছে না। একটু খোঁড়াচ্ছেন। বারান্দা পার হয়ে তিনি বাগানের দিকে চলে গেলেন। ললিতা হাঁ করে চেয়ে রইল। সে আগে কখনো একনাথকে নীচের তলায় নামতে দেখেনি।

ওদিকে কুসুম ঠাকুরঘর থেকে পুজোর ফুল সাজিতে নিয়ে একনাথের ঘরে গেল। বিছানার পাশে সাজি রেখে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ঘরে একনাথ নেই। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবল— বাবা আবার কোথায় গেলেন! ঘর ছেড়ে কোথাও তো যান না। জানলা খোলা দেখে সে গিয়ে নীচে উঁকি মারল।

একনাথ বাগানে পৌঁছে গেছেন, সোমনাথকে লক্ষ্য করে তিনি বলছেন— দাঁড়া, ওরকম করে ঘোড়ায় চড়ে না—এই দ্যাখ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

কুসুম গালে হাত দিয়ে জানলা থেকে সরে এল—ওমা কি হবে, বাবা একেবারে নীচে নেমে গেছেন! মা চণ্ডী, রক্ষে করো।

কুসুম ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাগানে চাকর-গোমস্তারা একনাথকে আসতে দেখে যে-যার সরে পড়ল। একনাথের কোনদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি গিয়ে সহিসের হাত থেকে লাগাম নিয়ে সোমনাথকে বললেন— অমন করে ঘোড়ায় চড়ে না। এদিকে আয়, আমার কাঁধে ভর দেহ্যাঁ-এবার ডান হাতে জিনের মুঠ ধরে লাফিয়ে ওঠ—এই তো ঠিক হয়েছে।

ঘোড়া মানুষ চেনে, সে এবার সরে গেল না। সোমনাথ রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। একনাথ তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন— লাগামে বেশি ঢিল দিস না। হ্যাঁ, এবার। বাগানের মধ্যে চক্কর দে; প্রথমেই ছুট দিস না— ধীর কদম

সন্তুষ্ট বিচারকের দৃষ্টিতে অশ্বারূঢ় নাতিকে পরিদর্শন করে একনাথ বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

বারান্দার সিঁড়ির মুখে ডাক্তার পাণ্ডের সঙ্গে দেখা। পাণ্ডে বাইরে ফটকের দিক থেকে আসছিলেন, একনাথকে নীচের তলায় দেখে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন– আরে এ কি কাণ্ড! আপনি একেবারে নীচে নেমে এসেছেন।

কেন আমি কি নীচে নামতে পারি না! তাঁর মনে যতই তেজ থাক শরীরের শক্তি কমে গিয়েছিল, তিনি ক্লান্তভাবে সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে মুখে বিক্রম দেখিয়ে বললেন–তুমি ভেবেছ কি? আমি অক্ষম অকর্মণ্য?

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—না না, বাবুসাহেব, কিন্তু আপনার পায়ের ব্যথাটা

কে বলে আমার পায়ে ব্যথা। তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এক ধাপ উঠেই তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল, মুখ বিকৃত করে পায়ের যন্ত্রণা দমন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামা যত সহজ, ওঠা তত সহজ নয়।

ঠিক এই সময় কুসুম দ্রুতপদে নেমে এল। সে কোন কথা না বলে একনাথের একটা বাহু তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রাখল, বলল–এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন আস্তে আস্তে উঠুন—

একনাথ গলার মধ্যে একটা হুম শব্দ করলেন, কোন আপত্তি করলেন না। ডাক্তার পিছন থেকে বললেন–আমিও আসব নাকি? দুদিক থেকে দুজন ধরলে আরো সহজে উঠতে পারবেন।

একনাথ কড়া সুরে বললেন—না না, তোমাকে দরকার নেই।

সিঁড়ির মাথায় উঠে একনাথ দাঁড়ালেন, কুসুম তাঁকে ছেড়ে দিল। ডাক্তারও পিছন পিছন উঠছিলেন, একনাথ তাঁর পানে বিজয়গর্বিত চোখে চেয়ে বললেন–দেখলে তো, পাখির মত উড়ে চলে এলাম।

ডাক্তার মিটি মিটি হেসে বললেন–হাঁ বাবুজি, একেবারে বাজপাখির মত। এবার চলুন, বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন।

আমার পা কিন্তু ঠিক আছে।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললেন–তাতে কোন সন্দেহ নেই। চলুন— চলুন—

নিজের ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুলেন, ডাক্তার ও কুসুম খাটের দুপাশে। একনাথের মেজাজ আবার চড়ে গেল, তিনি ডাক্তার পাণ্ডের পানে কটমট চক্ষে চেয়ে বললেন— তোমার অত্যাচার আর আমি সহ্য করব না। রাতদিন একটা ঘরের মধ্যে আমাকে আটক করে রেখেছ। আমি কি জেলখানার কয়েদী? তুমি যাও, নিজের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব— ফের যদি তুমি এসে আমার পিছনে লাগো, হুলস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে

পাণ্ডে প্রসন্ন স্বরে বললেন-না না বাবুজি, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি, আপনি ডেকে না পাঠালে আর আমি আসব না। কেমন, তাহলে হবে তো? আচ্ছা, আজ চলি। কুসুমের দিকে চেয়ে একটু হেসে তিনি বিদায় নিলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর একনাথ একটা হাঁটু তুলে সন্তর্পণে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, মনে হল বাতে আক্রান্ত হাঁটুটা ফুলেছে। তিনি হাঁক ছাড়লেন—গোবর্ধন।

কুসুম খাটের আরো কাছে এসে বলল–বাবা, গোবর্ধনকে ডেকে দেব? কি দরকার আমাকে বলুন না।

মুখ গোঁজ করে একনাথ বললেন–হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। ডাক্তারের ওই দুর্গন্ধ ওষুধ আর লাগাব না। গোবর্ধনকে বল একবাটি তেল গরম করে এনে হাঁটুতে মালিশ করে দিক।

কুসুম বলল–আমি এক্ষুনি গরম তেল এনে মালিশ করে দিচ্ছি, আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।

একনাথ উঠে বসার উপক্রম করে বললেন— কিন্তু

কুসুম তাঁকে আবার শুইয়ে দিয়ে বলল— আপনি শুয়ে থাকুন, আমাকে আপনার পদসেবা করতে দিন। সে দ্রুতপদে চলে গেল।

একনাথ বাষ্পাকুল চোখে ঊর্ধ্বে চেয়ে রইলেন।

.

বাগানে একটা গাছের ছায়ায় ঘোড়ার পিঠে বসে সোমনাথ বিশ্রাম করছে; সহিস পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিল।

সহিস কপালের ঘাম মুছে বলল—এইবার নামুন ছোটসাহেব। আবার বিকেলে চড়বেন।

সোমনাথ বলল— আর এক চক্কর দেব। তোমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি এখানেই থাকো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।

লাগাম নেড়ে সে ঘোড়াকে চালু করল।

.

একনাথ পূর্ববৎ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একটি বাটিতে সর্ষের তেল এবং লম্বা এক টুকরো ফ্ল্যানেল কাপড় নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আংটা নিয়ে গোবর্ধন। কুসুম ইশারা করল, গোবর্ধন একটি টিপাইয়ের ওপর আংটা রেখে টিপাই খাটের পাশে এনে রাখল। কুসুম আঁচের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে একটি ছোট প্যাকেট খুলে অল্প কর্পূর তেলের মধ্যে ফেলে দিল, গোবর্ধনকে বলল—গোবর্ধন, বাবুসাহেবের হাঁটুর নীচে বালিশ দাও।

একনাথ এতক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন, বিরক্ত মুখে বললেন—এসব কি হচ্ছে?

কুসুম বলল— গরম তেল কর্পূর দিয়ে হাঁটুতে মালিশ করব।

কী হবে মালিশ করে?

ব্যথা সেরে যাবে। খাটের কিনারায় বসে কুসুম গরম তেলে আঙুল ডুবিয়ে মালিশ করতে শুরু করল, অনুযোগের সুরে বলল— এই শরীরে কি বাড়াবাড়ি সহ্য হয়। আমি জানতে পারলে হরগিস্ নীচে নামতে দিতুম না। – গোবর্ধন, বাবুসাহেবের কপালে ঘাম হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস কর।

একনাথ বকুনি খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। গোবর্ধন তাঁর মাথায় বাতাস করতে লাগল।

কুসুম তেল মালিশ করছে আর আংটায় ফ্ল্যানেল তাতিয়ে সেঁক দিচ্ছে। সে কতকটা যেন নিজ মনেই বলতে লাগল বাতের ব্যথা কি সহজ ব্যথা, অনেক যত্ন নিলে তবে সারে। তারপর সেরে গেলে যা ইচ্ছে করা যায়। ব্যথা কি একটু কম মনে হচ্ছে?

একনাথ হাঁটু একটু নাড়াচাড়া করে বললেন–হুম, আর তেমন চিড়িক মারছে না। তুমি যাও, আর সেঁকের দরকার নেই।

কুসুম বলল— সে কি বাবা, আরো আধঘণ্টা সেঁক দিতে হবে। আজ সারা দিন বিছানা থেকে উঠতে পাবেন না। গোবর্ধন, যাও, আরো কাঠকয়লা নিয়ে এস।

গোবর্ধন চলে গেল। একনাথ মুখ গোমড়া করে বললেন—বেশ, লাগাও মালিশ, তোমারই কষ্ট, আমার কি! আমি দশদিন বিছানা থেকে উঠব না।

এই সময় গোবর্ধন ছুটতে ছুটতে এসে বলল— সর্বনাশ হয়েছে, ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন!

একনাথ খাড়া উঠে বসলেন কি বললি, সোমনাথ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে! কি করে পড়ল! কোথায় পড়ল?

গোবর্ধন বলল–তা তো জানি না হুজুর, সহিস ছুটে এসে বলল, ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।

একনাথ বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন-যত সব অপদার্থের দল

কুসুম বাধা দিয়ে বলল— বাবা, আপনি খাট থেকে নামবেন না। আপনার পা—

চুলোয় যাক পা! ছেলেটা বাঁচল কি মরল কেউই দেখছে না, কেবল চেঁচাচ্ছে— একনাথ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

কুসুম ছুটে এসে বাধা দিল বাবা, আপনি ঘরে থাকুন, আমি নীচে গিয়ে দেখছি কী হয়েছে। দেখেই আপনাকে খবর দেব। ছেলেরা কত পড়ে যায়, কত হাত-পা ভাঙে, তার জন্য এত ভাবনার কী আছে।

কোন কথায় কান না দিয়ে একনাথ বললেন–গোবর্ধন, লাঠিটা দে। —কোন কথা শুনতে চাই না আমি নীচে যাচ্ছি। ছেলেটার যদি কিছু হয়ে থাকে কাউকে আস্ত রাখব না লাঠি ধরে একনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে বেরুলেন।

কুসুম তেলের বাটি ইত্যাদি তুলে নিতে নিতে বলল—গোবর্ধন, তুমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাও, নইলে হয়তো পড়ে যাবেন। আমি আসছি।

গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল।

একনাথ তখন সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামছেন। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাঁর অনুগামী হল।

সিঁড়ির নীচে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ললিতা দোল খাচ্ছিল, একনাথ সেখানে নেমে এক গর্জন ছাড়লেন শম্ভু! গজাধর। রঘুয়া। কোথায় গেল হতভাগারা! দৌড়ে যা, দ্যাখ সোমনাথ কোথায়?

গর্জনের প্রথম ধাক্কাতেই ললিতা ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে গেল। একনাথের সেদিকে লক্ষ্য নেই, তিনি পা টেনে টেনে বাগানের দিকে চললেন। তিন-চার জন চাকর তাঁর দিকে ছুটে আসছে দেখে তিনি আবার চিকুর ছাড়লেন— এদিকে আসছিস কেন রে অলপ্পেয়ের দল, সোমনাথ কোথায় আগে দ্যাখ

চাকরেরা পাকসাট খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে কুসুম তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখল ললিতা কাঠের ঘোড়া উল্টে সিঁড়ির নীচে চুপটি করে পড়ে আছে, সে তাকে হাত ধরে তুলে একনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একনাথ হতাশ স্বরে বললেন–ভগবান জানেন কোথায় পড়ে আছে ছেলেটা! সহিসটাই বা কেমন

এই সময় ঘোড়র ক্ষুরের টগবগ আওয়াজ শোনা গেল। একনাথ কথা থামিয়ে সেইদিকে তাকালেন। কদম-চালে ঘোড়া চালিয়ে সোমনাথ আসছে। একনাথ মহা উল্লাসে দু হাত তুলে বললেন–আরে এই তো সোমনাথ। তবে যে হতভাগারা বলল ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে!

সোমনাথ এসে একনাথের সামনে ঘোড়া থামাল, একমুখ হাসি নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, বলল–হ্যাঁ দাদু, ঘোড়াটা আমায় ফেলে দিয়েছিল। এই দ্যাখো গায়ে ধুলো লেগেছে। কিন্তু আমি তখনি আবার উঠে এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসলাম। কি করে ঘোড়ার পিঠে চড়তে হয় এখন আমি শিখে নিয়েছি, আর আমাকে ফেলতে পারবে না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে একনাথ সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—শাবাশ! এই তো পুরন্দরপুরের সিংহ বংশের ছেলে। বৌমা, দেখেছ, ছেলে কাকে বলে!

কুসুম দেখবে কী, তার দুই চোখে তখন কান্নার বান ডেকেছে।

ব্যস্তসমস্তভাবে ডাক্তার পাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন—এ কি, আবার আপনি নেমে এসেছেন। পায়ের ব্যথাটা কি সারতে দিতে চান না?

যাও যাও ডাক্তার, তোমার ডাক্তারি আর আমার দরকার নেই। তোমার চেয়ে ঢের ভাল ডাক্তার আমি পেয়েছি। একনাথ সগর্বে কুসুমের পানে চাইলেন–হাঁটুতে অ্যায়সা গরম তেল মালিশ করেছে যে ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

একনাথ নাতির কাঁধে হাত রেখে প্রায় স্বাভাবিক চালে সিঁড়ির দিকে চললেন, কুসুম তাঁদের পিছন পিছন গেল। ডাক্তার কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখ পরম তৃপ্তির হাসিতে ভরে উঠল।

.

মানুষের জীবনে দশটা বছর অল্প কাল কী দীর্ঘ কাল তা নির্ণয় করা কঠিন। সুখী দম্পতির জীবনের দশটা বছর চক্ষের পলকে কেটে যায়, আবার কয়েদীর জীবনে দশ বছর কেটেও কাটতে চায় না। সবই আপেক্ষিক।

পুরন্দরপুরের জমিদারবাড়িতে সকলের বয়স দশ বছর বেড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পুরোহিতমশাই গৃহদেবীর পূজা করেন, স্তোত্রপাঠ করেন। গোবর্ধনের কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে, তবু সে মাঝে মাঝে তারা-ঝির হাত ধরে হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করে, কর্তা অনেকদিন তাকে গালমন্দ করেননি।

কর্তা রোজ সকালবেলায় নীচের তলায় দপ্তরখানার চৌকিতে এসে বসেন। পিছনে ও দুপাশে মোটা-তাকিয়া, হাতে গড়গড়ার নল। নায়েব হিসেবের খাতা খুলে আয়ব্যয়ের

বয়ান শোনায়। একনাথের বয়স এখন সত্তর, কিন্তু তাঁর শরীরে বার্ধক্যের শিথিলতা আসেনি; মুখের উগ্র গাম্ভীর্য যেন একটু নরম হয়েছে। দশটা বছর তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে অতি লঘুপদে চলে গেছে, কোথাও পদচিহ্ন রেখে যায়নি। ছেলেকে হারিয়ে তিনি যে মানসাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন, নাতিকে পেয়ে সে-দাহ শীতল হয়েছে।

বিকেলবেলা কুসুম ললিতার চুল বাঁধতে বসে। ললিতার বয়স এখন পনেরো-যোলো; চেহারাটি ভারি স্নিগ্ধ। কৈশোরের উপকূলে দাঁড়িয়ে সে আসন্ন যৌবনের সোনার তরীর অপেক্ষা করছে।

চুলবাঁধার সময় ললিতা প্রশ্ন করে—বৌমা, বাবু কবে ফিরে আসবে?

কুসুম বলে-কলেজের ছুটি হলেই আসবে।

এবার তো একবারে ছুটি, পড়া শেষ, আর কলেজে ফিরে যেতে হবে না?

না, আর ফিরে যেতে হবে না।

ললিতা কুসুমকে বৌমা বলে বাড়ির অন্য সকলের দেখাদেখি। সোমনাথকেও ছোটবাবু বলত, এখন শুধু বাবু বলে।

চার মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরে এল।

ডাক্তার পাণ্ডে তাকে তিন মাইল দূরের রেলস্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন। জমিদার বাড়িতে একজন স্থায়ী রোগীর অভাবে ডাক্তার পাণ্ডে এখন আর আসেন না, তবে জরুরী ফাইফরমাস খাটায় সময় তাঁর তলব পড়ে।

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সোমনাথ উপস্থিত হল। একনাথ সদর ফটকের সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে পরিজন বেষ্টিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সোমনাথ একলাফে গাড়ি থেকে নেমে একনাথকে প্রণাম করল, একনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

সোমনাথের দেহে স্বাস্থ্যভরা যৌবনের দীপ্তি, মুখে নির্ভীক আনন্দের হাসি। একনাথ তার মুখের পানে সগর্ব চোখে চেয়ে গলার মধ্যে একটা শব্দ করলেন–হুঁ। পরীক্ষা কেমন হল?

সোমনাথ প্রফুল্ল স্বরে বলল–ভাল হয়নি দাদু। তবে পাস করে যাব বোধহয়।

একনাথ আবার গলার মধ্যে শব্দ করলেন— খালি হকি আর ফুটবল খেলেছ। যাও, এখন মুখহাত ধুয়ে খাও গিয়ে, তোমার মা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সোমনাথ একদৌড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। একনাথ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন— তুমিও এস ডাক্তার। আজ এখানেই মধ্যাহ্নভোজন করবে।

.

কুসুম আর ললিতা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, সোমনাথ এসে মাকে প্রণাম করল। তারপর ললিতার পানে চেয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। চার মাস আগে সে যে ললিতাকে দেখে গিয়েছিল, এ যেন সে ললিতা নয়। তার বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কিন্তু সে চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে কুসুমকে বলল–মা, এ মেয়েটা কে? একে তো আগে কখনো দেখিনি।

কুসুম একটু হেসে ঘরের দিকে পা বাড়াল, বলল–খাবার সাজিয়ে রেখেছি, খাবি আয়।

ললিতাও সোমনাথকে দেখে হঠাৎ জড়সড় হয়ে পড়েছিল, তার মুখে একটু ভীরু হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সোমনাথের কথায় তার হাসিটুকুও শুকিয়ে গেল। সোমনাথ যে মনের উচ্ছ্বাস চাপা দেবার জন্যে ঠাট্টা-তামাশার আশ্রয় নিয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল সোমনাথ সত্যিই তাকে চিনতে পারেনি।

বাবু। তুমি আমায় চিনতে পারলে না?

না। তোমার নাম কি?

ললিতার চোখ জলে ভরে উঠল, সে চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

এই ললি— ব্যগ্রভাবে সোমনাথ তার অনুসরণ করতে গেল, কিন্তু ঘর থেকে মায়ের ডাক এল-সোমনাথ।

সোমনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থেমে গেল, মায়ের আহ্বানে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

.

বাগানে একটা গাছের তলায় পাথরের বেদি, ললিতা সেই বেদির ওপর বসে উদাস চোখে অদূরে ফোয়ারার পানে চেয়ে আছে। অভিমানে তার বুক ফুলে উঠছে। বাবু তাকে চিনতে পারল না! চার মাসে ভুলে গেল!

পিছন থেকে সোমনাথ নিঃশব্দে এসে তার চোখ টিপে ধরল। ললিতা প্রথমে চমকে উঠল, তারপর চুপ করে বসে রইল। সাড়াশব্দ নেই।

সোমনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল–আমি কে!

ললিতা ভারী গলায় বলল— জানি না।

চোখ ছেড়ে দিয়ে সোমনাথ ললিতার পাশে বসল, বলল—রাগ হয়েছে?

ললিতা উত্তর দিল না, অন্যদিকে চেয়ে রইল। সোমনাথ তখন বলল–সত্যিই কি আমি তোমাকে চিনতে পারিনি! তুমি এই কমাসে এতবড় হয়ে গেছ যে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

তবে কেন আমায় ভয় দেখালে? জল-ভরা চোখ সোমনাথের পানে ফিরিয়ে ললিতা তার কাঁধে মাথা রাখল। সোমনাথ তার কাঁধ জড়িয়ে নিয়ে স্বলিত স্বরে বলল–আর ভয় দেখাব না।

তাদের মন গঙ্গা-যমুনার মত সঙ্গমের পানে ছুটে চলেছে। ছেলেবেলার সহজ সাহচর্যের প্রীতি অন্যরূপ ধারণ করেছে। স্থির সমুদ্র সহসা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

দপ্তরখানার চৌকিতে বসে বিকেলবেলা একনাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। সামনে ডাক্তার পাণ্ডে। পাণ্ডের সামনে রুপোর রেকাবিতে পান, তিনি মাঝে মাঝে পান তুলে মুখে দিচ্ছেন। অলসভাবে গাল-গল্প হচ্ছে। জল-হাওয়া চাষবাসের অবস্থা এইসব নিয়ে আলোচনা।

গোবর্ধন আফিমের কৌটো আর জলের গেলাস নিয়ে এল। একনাথ আফিমের গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, একঢোঁক জল খেলেন, তারপর আবার গড়গড়ার নল তুলে নিলেন। গোবর্ধন কৌটো গেলাস নিয়ে চলে গেল।

তারপর এলেন দেওয়ান। তাঁর হাতে কয়েকটা চিঠি। একনাথ প্রশ্ন করলেন— জরুরী চিঠি কিছু আছে?

দেওয়ান বললেন–আজ্ঞে দুখানি চিঠি জরুরী বলা চলে। ছোটবাবুর জন্যে পাত্রীর খবর আছে।

একনাথ বললেন— ও...কারা খবর দিয়েছে? কেমন লোক? ইদানীং যেসব সম্বন্ধ আসছে আমার তেমন পছন্দ নয়। বংশমর্যাদা না থাকলে তো মেয়ে আনা যায় না। কারা চিঠি লিখেছে?

দেওয়ান বললেন–আজ্ঞে পড়ে শোনাচ্ছি। এটি লিখেছেন তেজপুরের নরোত্তম সিংহ, পাত্রী তাঁর তৃতীয়া কন্যা

একনাথ চিন্তা-মন্থর স্বরে বললেন-তেজপুরের নরোত্তম সিংহ...তাদের বরাবরই জানি, আমাদের সমান ঘর বলা যায়। কিন্তু জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় প্রায় সবই গেছে। (দেওয়ানকে) যতদূর মনে পড়ে ওদের একটা সম্পত্তি আমাদের কাছে বন্ধক আছে, তাই না? (দেওয়ান ঘাড় নাড়লেন) বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু এমন ভাঙনধরা ঘর থেকে সোমনাথের বৌ আনতে পারি না।

দেওয়ান চিঠিখানা সরিয়ে রেখে অন্য চিঠি নিলেন এটি লিখেছেন রায় গোপীকিশোর, ও বি ই, কে সি আই ই।

ইনি কে? নাম তো কখনো শুনিনি।

পাণ্ডে বললেন— খুব বিখ্যাত লোক, দিল্লীর একজন বড় ব্যাংকার। অনেকগুলো কাপড়ের কলের মালিক, প্রচুর টাকা করেছেন।

একনাথ বললেন— তা না হয় হল। কিন্তু বংশ কেমন? বংশের কথা কিছু আছে?

চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে দেওয়ান বললেন— বংশের কথা কিছু দেখছি না। কেবল লিখেছেন মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জামাইকে চার লক্ষ টাকা যৌতুক দেবেন। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, দরকার হলে ফটো পাঠাবেন।

মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করে একনাথ বললেন— যতসব ভূঁইফোঁড় বড়লোক। টাকা দেখাচ্ছে। বংশগৌরব নেই, বড়ঘরে মেয়ে দিয়ে জাতে উঠতে চায়। উঁহু, বাদ দাও। — পাণ্ডে, দেখছ সমাজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? বনেদী ঘরের লোক যারা তাদের হাতে পয়সা নেই, আর যাদের পয়সা আছে তাদের বংশগৌরব নেই। বিদেশী রাজা রোজ নতুন আইন তৈরি করছে, সাবেক যা কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এসব কি ভাল?

পাণ্ডে বললেন কিন্তু বাবুসাহেব, সময় বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে তো। পরিবর্তন না হলে চলবে কেন? ভেবে দেখুন, সেকালে মানুষ গরুর গাড়ি চড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে যেত, এখন রেলগাড়ি চড়ে যায়। এটা কি মন্দ?

একনাথ বললেন–না না, এসব তোমার বাজে যুক্তি। রেলগাড়ি চড়ে চড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজের খুঁটি হল পরিবার বংশ। সেই খুঁটি যদি উপড়ে ফেলে দাও তাহলে কী থাকবে? সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বললেন আমার ছেলে একটা মস্ত ভুল করেছিল, তার ফল সে পেয়েছে। আমি এখন সেই ভুল শোধরাতে চাই। কালির দাগ মুখে ফেলতে হবে।

পাণ্ডে বললেন কিন্তু শুধু বংশই নয়, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তাও তো আছে। স্বতন্ত্র সাধ আহ্লাদ, স্বাধীনতা— সবই কি বংশের জন্যে বিসর্জন দিতে হবে? সমাজ বলুন, বংশ বলুন, সবই তো মানুষের জন্যে

কড়া সুরে একনাথ বললেন-না, বংশই হল সমাজের মূল, বংশ নিয়েই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে পাণ্ডে বললেন—বাবুসাহেব, আপনার এ ধারণা বর্তমান যুগে একেবারে অচল। পৃথিবী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, এখন আর কেউ একা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। সব মানুষ মিলিয়ে সমাজ, আমরা সবাই যেন এক পরিবারের মানুষ। নিজের বংশমর্যাদার অহংকারে কেউ যদি আলাদা থাকতে চায়, ক্ষতি তারই

একনাথ বললেন— তোমার এসব যুক্তি আমি মানি না। সিংহ চিরদিন সিংহই থাকবে, কখনো শেয়ালের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবে না। এই হল আমার কথা। যতদিন বেঁচে থাকব, আমার বাড়িতে এই রেওয়াজ চলবে, অন্য কারুর কথা খাটবে না।

পাণ্ডে বিষণ্ণভাবে মুখ নীচু করে বসে রইলেন। একজন টেলিগ্রাফ পিওন এসে সেলাম করে দাঁড়াল। দেওয়ান প্রশ্ন করলেন—তার আছে?

রসিদ সই করে দেওয়ান তার হাতে নিলেন, একনাথের পানে চাইলেন। একনাথ বললেন— খুলে দেখ, ভাল খবর কি মন্দ খবর।

পিওন বলল–ভাল খবর হুজুর, বকশিশ দিতে হবে।

পাণ্ডে খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রাম পড়লেন ভাল খবর। সোমনাথ এম-এ পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

একনাথের উৎকণ্ঠিত মুখ আনন্দে ভরে উঠল—অ্যা! পাস করেছে! আমি জানতাম পাস করবেই। দেওয়ান, যাও, পিওনকে পঁচিশ টাকা বকশিশ দাও।

পিওন বকশিশের বহর দেখে চোখ গোল করে দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ান পকেট থেকে পঁচিশ টাকার নোট নিয়ে পিওনকে দিলেন। পিওন আভূমি সেলাম করে চলে গেল।

একনাথ টেলিগ্রামের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, দাও।

একনাথ ইংরেজি জানেন না, তবু পরম যত্নে টেলিগ্রামটি চোখের সামনে রেখে তার রসাস্বাদন করলেন। গদগদ স্বরে বললেন–ছেলেটার বুদ্ধি আছে, কি বল?

পাণ্ডে বললেন–সে আর বলতে! কোন্ বংশের ছেলে! ওর বাপও তো এই বয়সে এম-এ পাস করেছিল।

একনাথ একটু থমকে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তা বটে। সোমনাথ কোথায়? যাই, আমি নিজে গিয়ে তাকে খবরটা শোনাই। তার সঙ্গে বাজি ছিল— মুচকি হাসতে হাসতে একনাথ উঠে ঘরের বাইরে গেলেন।

পাণ্ডে একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর মুখে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। দেওয়ান তাঁর কাছে এসে বললেন— আকাশের পানে চেয়ে কী দেখছেন?

ডাক্তার বললেন–সিঁদূরে মেঘ।

4

কুসুম নিজের ঘরের বিছানায় বসে কাপড়ের ওপর ফুল তুলছে, ললিতা তার পিছনে হাঁটু গেড়ে তার মাথা থেকে পাকা চুল তুলছে।

কুসুম বলল—হয়েছে, অনেক তুলেছিস।

ললিতা চুল তুলতে তুলতে বলল— আর কয়েকটা হলেই শেষ, তোমার মাথা একেবারে কালো হয়ে যাবে।

মুখ তুলে কুসুম হেসে বলল–কালো মাথা আমার দরকার নেই। ছেলে বড় হল, দুদিন পরেই নাতির মুখ দেখব।

ললিতা একটু থতমত খেয়ে জড়িত স্বরে বলল–তার এখনো অনেক দেরি আছে।

কুসুম বলল— সে যা হোক, আমার মাথা ছেড়ে তুই একবার বাইরে গিয়ে দ্যাখ সোমনাথ কোথায়, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ললিতা একটু উসখুস করে বলল-ও এখন বাগানে পাখির ঘর তৈরি করছে। দিনরাত তাতেই লেগে আছে। পাখির ঘর ছাড়া অন্য ভাবনা নেই।

কুসুম বলল—যা ডেকে নিয়ে আয়। তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

ললিতা উঠে দোরের দিকে যাচ্ছে, বাইরে থেকে একনাথের গলায় ডাক এল-বৌমা। বৌমা।

ললিতা এখনো একনাথকে ভয় করে, সে তাড়াতাড়ি দোরের পাশে লুকিয়ে পড়ল। কুসুম মাথায় আঁচল টেনে উঠে দাঁড়াল—বাবা।

টেলিগ্রামখানা নাড়তে নাড়তে একনাথ ঘরে ঢুকলেন— খবর শুনেছ, ছোঁড়া পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস-এইমাত্র তার এল। আমি ওর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম ও পাস করতে পারবে না, যদিও মনে মনে জানতাম পাস করবেই। হ্যা! হ্যা!

দোরের আড়াল থেকে খবর শুনে ললিতার মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে একনাথের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একনাথ বললেন—একটা কিছু করা দরকার আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম। তুমি পুরুতঠাকুরকে এই হপ্তায় একটা ভাল দিন দেখতে বল, সেদিন বাড়িতে উৎসব হবে—বাঈনাচ, বাজি পোড়ানো, গাঁয়ের মাতব্বরেরা আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, বাড়ি জমজমাট হবে। কি বল?

কুসুম ক্ষীণ স্বরে বলল,-আপনার যা ইচ্ছে তাই হবে বাবা।

একনাথ বললেন-বেশ। কিন্তু সোমনাথ গেল কোথায়? বাড়িতে কোথাও দেখছি না।

কুসুম বলল–শুনলুম বাগানে কোথায় নাকি পাখির ঘর বানাচ্ছে। —ডেকে পাঠাচ্ছি।

না না, আমি নিজেই যাচ্ছি। একেবারে চমকে দেব। —পাখির ঘর বানাচ্ছে। হুঁঃ হুঁ– নিজের ঘর বানাবার সময় হয়েছে কিনা–গলার মধ্যে হাসি চেপে রেখে একনাথ চলে গেলেন।

.

বাগানের এককোণে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সোমনাথ বাঁশের খুঁটোর ওপর তক্তা দিয়ে পাখির বাসা তৈরি করছে। অনেকটা পায়রার খোপের মত। ছোট ছোট পাখিরা এসে তার মধ্যে বাসা বাঁধবে, ডিম পাড়বে, বাচ্চা ফোটাবে, এই তার লক্ষ্য।

ললিতা ছুটতে ছুটতে সেই দিকে আসছিল, কাছাকাছি এসে সে টিপে টিপে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সোমনাথ তখন ঠকঠক হাতুড়ি চালিয়ে পেরেক ঠুকছে, ললিতা পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরল।

এই ললি, কী হচ্ছে

ললিতা তার কানে কানে বলল—একটা ভারি সুখবর এনেছি, কী খাওয়াবে বল?

চোখ থেকে ললিতার হাত ছাড়িয়ে সোমনাথ ফিরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ ললিতার হাসিভরা মুখের পানে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে বলল—কী খাওয়াব? এমন খাবার খাওয়াব যা খেতে খুব মিষ্টি কিন্তু পেট ভরে না।

ললিতা অবাক হয়ে এক পা কাছে সরে এল, বলল—সে আবার কী খাবার?

কী খাবার জান না? সোমনাথ নিজের আঙুল ললিতার ঠোঁটে ঠেকিয়ে সেই আঙুল নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করল, বলল—এই খাবার।

লজ্জায় লাল হয়ে ললিতা এক পা পিছিয়ে গেল। বলল-যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।

সোমনাথ মুখ টিপে হাসল কই, কি সুখবর বলবে না?

ললিতা আবার এগিয়ে এল দাদুর কাছে তার এসেছে, তুমি পাস করেছ, ফার্স্ট ক্লাস

ওদিকে একনাথ টেলিগ্রামের হলদে রঙের কাগজখানা হাতে নিয়ে সোমনাথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, ঝোপের মধ্যে সোমনাথ ও ললিতাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওরা তাঁকে দেখতে পায়নি, সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে খাটো গলায়

কথা বলছে, ললিতার চোখ দুটি সোমনাথের মুখের দিকে উঠতে উঠতে আবার নত হয়ে পড়ছে। দুজনের মুখেই ভঙ্গুর হাসি। তারপর সোমনাথ ললিতাকে আরো কাছে টেনে নিল, ললিতা তার বুকে মুখ লুকলো।

একনাথ দেখলেন, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। ক্রোধে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি ধৈর্য হারিয়ে ওদের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু এক পা গিয়ে তিনি থমকে গেলেন, তারপর পিছু ফিরে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। টেলিগ্রামের কাগজটা অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতে ধরা রইল। সোমনাথ তখন ললিতার দুই কাঁধে হাত রেখে মুখের কাছে মুখ এনে সুর করে বলছে

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হারা
কিশোরী ভজন কিশোরী পুজন
কিশোরী নয়ন তারা।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে একনাথ বিক্ষিপ্ত চিত্তে পায়চারি করতে লাগলেন। পঁচিশ বছর আগে যা ঘটেছিল, আবার কি তার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হল! লাঠিয়ালের মেয়েকে সোমনাথ! কি কুক্ষণে মেয়েটাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

হাতে টেলিগ্রামের কাগজটার ওপর নজর পড়ল। ইচ্ছে হল কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলেন। কিন্তু তা না করে পকেটে রাখলেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দুরবগাহ দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ডুবে গেল।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যের ছায়া নেমেছে এমন সময় গোবর্ধন এসে দোরের কাছে দাঁড়াল বাবু, তামাক সেজে আনব? আপনার আফিম খাবার সময় হয়েছে।

সুপ্ত বাঘের ঘাড়ে পা দিলে যেমন হয়, একনাথ গর্জে উঠলেন-হতভাগা উল্লুক! কে তোকে ডেকেছে?

গোবর্ধন থতমত খেয়ে বলল—আজ্ঞে

বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা! একনাথ আরক্ত চোখে চেয়ার থেকে ওঠবার উপক্রম করলেন।

গোবর্ধন একনাথের এমন উগ্র মূর্তি অনেক দিন দেখেনি, সে ভড়কানো ঘোড়ার মত ছুটে পালাল।

কুসুম ঠাকুরঘরের প্রদীপ জ্বেলে বাইরে এসে দেখল গোবর্ধন মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল— কি হয়েছে গোবর্ধন?

গোবর্ধন বলল— আর বৌদিদি, যা হবার তাই হয়েছে। এতদিন পরে কর্তাবাবু আবার রেগে গেছেন।

কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল— কি বলবে খুলে বল।

গোবর্ধন খুলে বলল। শুনে কুসুমের মন নানারকম সন্দেহে ভরে উঠল। সে প্রশ্ন করল সোমনাথ কোথায়?

গোবর্ধন বলল—তা তো জানি না বৌদিদি। দেখব?

না, থাক—বাবার ঘরে আলো দিয়েছ?

না বৌদিদি। তাঁর এখন আফিমও খাওয়া হয়নি। বাঘের মত চেহারা দেখেই পালিয়ে এসেছি।

তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি দেখছি।

একনাথ অন্ধকার ঘরে বসেছিলেন, কুসুম কেরাসিনের টেবিল ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢুকল, টুলের ওপর ল্যাম্প রেখে বলল–বাবা, আফিম দেব?

নিরাসক্ত সুরে একনাথ বললেন–দাও।

দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো এনে কুসুম একনাথের হাতে দিল, কুঁজো থেকে জলের গেলাস ভরে পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিতে দিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বললেন— সব ভেঙে পড়ছে, আবার সব ভেঙে পড়ছে।

কুসুম চেয়ারের পাশে নতজানু হয়ে ব্যগ্র স্বরে বলল–কিছু ভেঙে পড়বে না বাবা, সব ঠিক থাকবে। এ বাড়িতে কারুর সাহস নেই আপনার কথার ওপর কথা বলে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

একনাথ মনে একটু সান্ত্বনা পেলেন, আস্তে আস্তে কুসুমের মাথার ওপর হাত রাখলেন।

সে রাত্রে কিন্তু আফিমের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর চোখে ঘুম এল না।

.

বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। চারিদিকে জন-মজুরের ভিড়। শহর থেকে বাঈজি আসবে, বাঈ-নাচ হবে, বাজিওয়ালা আসবে, বাজি পোড়ানো হবে। আশেপাশের গণ্যমান্য সকলের কাছে নিমন্ত্রণপত্র গিয়েছে। দেওয়ান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ তদারক করছেন।

বাগানের এক পাশে গোলাপের কেয়ারি। সোমনাথ সেই দিক দিয়ে যেতে যেতে একটি রাঙা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে তার আঘ্রাণ নিল, তারপর সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে পাখির খাঁচার দিকে চলল।

খুঁটোর ওপর জাল দিয়ে ঢাকা খাঁচার মধ্যে একঝাঁক মুনিয়া পাখি খেলা করছে, ললিতা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাদের দেখছে। সোমনাথ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ললিতা বিগলিত আনন্দে বলল–কি সুন্দর পাখি!

সোমনাথ গোলাপ ফুলটি তার চোখের সামনে ধরল–আর এটা? সুন্দর নয়?

ললিতা ফুল দেখে বলল–খুব সুন্দর। কিন্তু এ তো দাদুর বাগানের ফুল! কারুর হাত দেবার হুকুম নেই।

জানি। আমি চুরি করেছি। এখন তুমি চোরাই মাল রাখো, আমি দাদুর কাছে চললাম।

ললিতা চোখ বিস্ফারিত করে বলল— দাদুর কাছে! কেন?

সোমনাথ বলল— দাদুকে বলতে যাচ্ছি তুমি তাঁর গোলাপ ফুল চুরি করেছ।

অ্যাঁ-না, সত্যি বল না কেন দাদুর কাছে যাচ্ছ?

সোমনাথ গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল জরুরী কাজ আছে। জরু-রী কাজ।

হঠাৎ হেসে উঠে ললিতার থুতনি নেড়ে দিয়ে সে চলে গেল।

.

কুসুম দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জলসা-মণ্ডপের নির্মাণ কার্য দেখছিল, ওদিকে একনাথ নিজের ঘরে কপালে হাত দিয়ে বসে দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাইরে উৎসবের আনন্দ-তৎপরতা, কিন্তু ঘরের কোণে দুর্ভাবনার উপছায়া।

কুসুম বারান্দা থেকে দেখল সোমনাথ বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। তার পদক্ষেপ এবং গতিভঙ্গিতে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা, যেন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছে। কুসুমের মন কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

সোমনাথ দোতলায় উঠে এসে একনাথের দোরে টোকা দিল— দাদু, আসব?

ঘরের মধ্যে একনাথ চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল তিনি আজ এক প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। একটু দম নিয়ে তিনি সহজ স্বরে ডাকলেন–আয় ভেতরে আয়।

সোমনাথ পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কুসুম বারান্দা থেকে দেখছিল, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। তার মনে অনেক রকম অস্পষ্ট উৎকণ্ঠার যাতায়াত শুরু হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে সোমনাথ একনাথের চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। একনাথ আতঙ্ক-ভরা চোখে তার পানে চাইলেন। সোমনাথ বলল–দাদু, আপনি বলেছিলেন পাস করলে আমাকে প্রাইজ দেবেন

একনাথ ভয়ার্ত চোখে চাইলেন। পঁচিশ বছর আগের আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। লোকনাথ সে-ও প্রাইজ চেয়েছিল।

একনাথ অস্ফুট গলায় বললেন— প্রাইজ অ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম বটে–তা তাড়া কিসের

সোমনাথ বলল— তাড়া নেই। কিন্তু আমি যে-প্রাইজ চাইব আপনি দেবেন তো?

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন। তাঁর অসহিষ্ণু উগ্র স্বভাবে কোথায় ঘুণ ধরেছিল, হঠাৎ মড় মড় করে ধূলিসাৎ হল। তিনি সোমনাথের একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন— ওরে, আমি জানি তুই কি চাইবি। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা শোন। আমি বুঝতে পেরেছি তুই ললিতাকে চাস। কিন্তু এই বুড়োটার একটা কথা মন দিয়ে শোন। আমি তোর দাদা, তুই আমার নাতি

প্রবল আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সোমনাথ বিস্ময়ভরে চক্ষু বিস্ফারিত করে চাইল। এত বিচলিত এমন অভিভূত অবস্থায় তাঁকে সে আগে কখনও দেখেনি। উপরন্তু সে কী চায় তা তিনি। বুঝতে পেরেছেন। কেমন করে বুঝলেন?

দোরের বাইরে মাথা নীচু করে কুসুম সব শুনছে।

সোমনাথ কোন কিছু বলার আগেই একনাথ আবার বলে উঠলেন— ললিতা আমার লাঠিয়ালের মেয়ে একথা তুই জানিস?

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল—কেন জানব না। একথা তো সবাই জানে, আমিও গোড়া থেকে জানি। কিন্তু

একনাথ বাধা দিয়ে বললেন–থাম–আগে আমাকে বলতে দে। —তুই আমার একমাত্র নাতি, আমি তোকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তোর বাবাকেও ভালবাসতাম। সে ছিল আমার একমাত্র বংশধর, উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার কাছে নিজের ভালবাসার চেয়ে বংশের মর্যাদা ঢের বেশি বড়। এরই জন্যে আমি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম। তাঁর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল–মা চণ্ডী জানেন, কী নরক-যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি। কিন্তু যা করেছি বংশের জন্যে করেছি, বাপ-পিতামহের মর্যাদা রক্ষার জন্যে করেছি। তাঁরা তোরও পূর্বপুরুষ, তোর জন্যে তাঁরা এই অগাধ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। তাঁদের প্রতি কি তোর কোন কর্তব্য নেই?

কিন্তু দাদু

আমার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শোন। তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। জানি তোরা এ যুগের ছেলে, তোদের রীতি-নীতি সবই আলাদা। তাকিয়ে দেখ, আমার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, আমার এই মাথাটি ধুলোয় লুটিয়ে দিস না। হঠাৎ সোমনাথের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন–আমাকে আগে মরতে দে। কদিনই বা বাঁচব। তারপর তুই হবি এই সংসারের কর্তা। তখন তোর যা মন চায় করিস, কেউ তোকে বাধা দিতে আসবে না।

শুনতে শুনতে সোমনাথের চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে। একনাথ তার মুখের পানে ব্যাকুল চক্ষে চেয়ে বলে উঠলেন–দাদু, তুই ছাড়া আমার সংসারে আর কেউ নেই, তুই আমার একটা কথা রাখবি না?

এবার সোমনাথ তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল, উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত অধরে বলল–দাদু, আপনি যাতে কষ্ট পান সেকাজ আমি কখনো করব না।

একনাথ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, নাতিকে বুকে জাপটে নিয়ে স্খলিত স্বরে বললেন-বেঁচে থাক— বেঁচে থাক—।

বাইরে দাঁড়িয়ে কুসুম সব শুনল, তারপর ঠোঁট কামড়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে কুসুম দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটি গোলাপ ফুল। ললিতা বলল-বৌমা, আমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দাও না।

কুসুম তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল— ওরে, কেন তোরা বড় হয়ে উঠলি, ছোট হয়েই থাকলি না কেন?

.

শামিয়ানার মধ্যে নাচ-গানের আসর বসেছে। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। বাগানেও অসংখ্য গ্যাসলাইটের দীপদণ্ড। সভায় অনেক গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হয়েছে, চিকের আড়ালে মহিলাদের স্থান। একনাথ সভায় বসে রুপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। মধুকণ্ঠী বাঈজি লহর তুলে গান গাইছে, সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত। বাঈজির পায়ে ঘুঙুর, সে গাইতে গাইতে ঘুরে ফিরে বাহু বিলোলিত করে নাচছে। সকলের চক্ষুকর্ণ বাঈজির ওপর বিন্যস্ত।

একনাথ অলসভাবে সভার চারিদিকে চোখ ফেরালেন। দেখলেন সোমনাথ সভার এক কোণে বসেছিল, কখন অলক্ষিতে উঠে গেছে। একনাথের কপালে একটু ভ্রুকুটি দেখা দিল, তিনিও আস্তে আস্তে উঠে সভার বাইরে গেলেন। সবাই বাঈজির সঙ্গীতসুধা পানে মোহাচ্ছন্ন, কেউ লক্ষ্য করল না।

বাগানের কোণে পাখির ঘরের ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ললিতা আর সোমনাথের কথা হচ্ছিল। দূর থেকে গ্যাসলাইটের ঝিলমিল আলো তাদের মুখের ওপর খেলা করছে। সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে ব্যগ্রস্বরে বলছিল—এই উৎসবনাচ গান—এসব আমার কাছে অর্থহীন-আমি তোমাকে চাই–ললি, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু দাদু

একনাথ ঝোপের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন। ললিতা বলছে—দাদু আমাকে চান না।

সোমনাথ বলল—ললি, তুমি দাদুকে ভুল বুঝো না। তিনি সাবেক কালের মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মত নয়। কিন্তু তিনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, আমি তাঁকে আর দুঃখ দিতে পারব না। দাদুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন আমি তোমাকে বিয়ে করব না।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই, দূর থেকে বাঈজির গানের কলি ভেসে আসছে। একনাথ উৎকর্ণ হয়ে আছেন।

শেষে সোমনাথ বলল—তুমি জানো, দাদু আমাকে কত ভালবাসেন। আমি যদি তাঁর কথা না শুনি, তিনি হয়তো মারা যাবেন...সে আমি পারব না। আর কদিনই বা তিনি বাঁচবেন। ললি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?

কান্নাভরা গলায় ললিতা বলল—পারছি।

আমরা দুজনে এক বাড়িতেই থাকব, কিন্তু দূরে দূরে থাকব। আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

না।

একনাথ আর সেখানে দাঁড়ালেন না, যেমন চুপিচুপি এসেছিলেন তেমনি চুপিচুপি ফিরে গেলেন।

.

রাত্রির উৎসব শেষ হয়েছে, আলো নিভে গেছে, যারা উৎসবে যোগ দিয়েছিল, সকলে চলে গেছে। উৎসব-মণ্ডপ অন্ধকারে আবৃত হয়ে শুন্য পড়ে আছে।

বাড়িও সুষুপ্ত অন্ধকার। কেবল একনাথ জেগে আছেন। তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। তিনি নিজের ঘরে একাকী পায়চারি করছেন। পায়চারি করতে করতে কখনো তিনি পালঙ্কের পাশে বসছেন, কখনো চেয়ারে বসছেন। তাঁর মন যেন ঝড়ের সমুদ্রে ওঠা-পড়া করছে।

সকাল হল, রোদ উঠল। একনাথ স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে চেয়ারে এসে বসলেন। বেশ প্রশান্ত মূর্তি, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। গোবর্ধন আফিমের কৌটো ও জলের গেলাস নিয়ে অপেক্ষা করছিল, চেয়ারের পাশে টিপাইয়ের ওপর

জলের গেলাস রাখল। একনাথ আফিমের কৌটো খুলে গুলি পাকাতে পাকাতে বললেন– গোবর্ধন, তুই যা, ডাক্তার পাণ্ডেকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন চোখে একবার তাঁর পানে তাকাল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না, আজ্ঞে বলে চলে গেল।

আধঘন্টা পরে ব্যাগ হাতে ডাক্তার এলেন। হাসিমুখে বললেন—কাল রাত্রে মজলিশ খুব জমেছিল। আপনি তো নটা বাজতে না বাজতেই উঠে গেলেন। কি ব্যাপার বলুন তো, ঠাণ্ডা লেগে গেছে নাকি?

একনাথ বললেন—না, ঠাণ্ডা লাগেনি। বোস, বলছি।

ডাক্তার বসলেন। একনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললেন—ডাক্তার, আমার শরীরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা কর দেখি। আমি জানতে চাই আর কতদিন বাঁচব।

ডাক্তার হেসে বললেন—এখনো অনেক দিন বাঁচবেন। গত কয়েক বছর আপনার তো সর্দিকাশি পর্যন্ত হয়নি। আপনারা দীর্ঘায়ুর বংশ, এরই মধ্যে মৃত্যুচিন্তা কেন?

একনাথ বললেন—দীর্ঘায়ুর বংশ হলেও সবাই তো সমান বাঁচে না। আমার ঠাকুর্দা তিরানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন, বাবা উনআশিতেই গিয়েছিলেন, আর লোকনাথ–। কিন্তু যাক। তুমি একবার পরীক্ষা কর।

একবার কেন, দশবার করব। কিন্তু আমি আপনার ধাত জানি, আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

আশঙ্কার—কারণ– নেই। হুঁ। একনাথ একবার ডাক্তারের মুখের পানে চাইলেন। ডাক্তার কি করে বুঝবে তাঁর মনের গোপন কথা!

তারপর ডাক্তার প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করলেন একনাথের শরীর। বুক পেট হৃদযন্ত্র ফুসফুস রক্তচাপ সব দেখলেন। লোহার ভাটার মত নিরেট শরীর, কোথাও দূর্বলতার চিহ্ন নেই।

লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাণ্ডে বললেন—আপনার বয়স কত জানি, তিয়াত্তর বছর। কিন্তু শরীরটা পঞ্চাশ বছরেই আটকে গেছে, আর বাড়েনি।

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন—হেঁয়ালি কোরো না, স্পষ্ট করে বলো আর কতদিন বাঁচব।

ডাক্তারের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল—যদি আত্মহত্যা না করেন, এখনো পনেরো কুড়ি বছর বাঁচবেন।

পনেরো কুড়ি বছর! বলতে বলতে একনাথের নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, তিনি যেন বিভীষিকা দেখছেন এমনি ভাবে চেয়ে রইলেন—আরো পনেরো কুড়ি বছর বেঁচে থাকব!

ডাক্তার ব্যাগের মধ্যে যন্ত্রপাতি ভরতে ভরতে বললেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিস করি বটে, কিন্তু একেবারে হেতুড়ে ডাক্তার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না করেন, শহর থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন—আচ্ছা চলি এখন, অনেকগুলো রোগীকে ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি ব্যাগ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ একনাথ অসাড় বসে রইলেন, তারপর উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মাথার মধ্যে চিন্তার বিষক্রিয়া চলতে লাগল-পনেরো-কুড়ি বছর...তখন দাদুর বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ...না না, এ হতে পারে না...কিন্তুবংশের অমর্যাদা আমি নিজের চোখে দেখব? না না, এ হতে পারে না...

সন্ধ্যের সময় একনাথ সোমনাথের দোরে টোকা দিলেন—দাদু, ঘরে আছিস?

সোমনাথ ঘরে একলা বসে ধূসর ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলল—এই যে দাদু।

সোমনাথ বেরিয়ে এল। একনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—চল আমার ঘরে, এক দান দাবায় বসা যাক। সেদিন তুই আমায় মাৎ করেছিলি, আজ আমি তোকে মাৎ করব। এমন মাৎ করব যে চিরদিন মনে থাকবে।

সোমনাথ মুখে হাসি এনে বলল-বেশ তো দাদু, বেশ তো। দেখা যাক কে কাকে মাৎ করে।

একনাথের ঘরে গিয়ে সোমনাথ দেখল বিস্তীর্ণ পালঙ্কের মাঝখানে দাবার বোর্ড পেতে ঘুঁটি বসানো হয়েছে। তখনো দিনের আলো একটু ছিল। একনাথ পালঙ্কের শিয়রের দিকে বসে হাঁক দিলেন–গোবর্ধন!

গোবর্ধন এসে দাঁড়াল—আজ্ঞে?

আলো দে। আর আমার আফিম রেখে যা।

আজ্ঞে। গোবর্ধন চলে গেল।

সোমনাথ খাটের ওপর বসল। আধা-অন্ধকারে খেলা আরম্ভ হল। তারপর গোবর্ধন আলো এনে টিপাইয়ের মাথায় রাখল, দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো নিল, গেলাসে জল ঢেলে একনাথের হাতের কাছে রেখে চলে যাচ্ছিল, একনাথ বললেন—ভাল কথা, গোবর্ধন, দাদুর পাস করার জন্যে তোকে বকশিশ করা হয়নি। এই নে। ফতুয়ার পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট নিয়ে তিনি গোবর্ধনের হাতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

গোবর্ধন নোটের তাড়া দেখে ঘাবড়ে গেল, বিহ্বলভাবে একবার নোটের পানে একবার একনাথের পানে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—বাবু, এ যে অনেক টাকা।

একনাথ দাবার ছক থেকে চোখ তুললেন না, হাত নেড়ে তাকে বিদেয় করলেন। সোমনাথের মন খেলায় নিবিষ্ট, সে কিছু লক্ষ্য করল না।

কিছুক্ষণ নীরবে খেলা চলল। কয়েক চাল পরে একনাথ নিজের ঘোড়াকে আড়াই ঘর এগিয়ে সোমনাথের রাজার সামনে বসালেন, বললেন-কিস্তি।

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সোমনাথ গলার মধ্যে শব্দ করল—হুম। একনাথ হাসি হাসি গলায় বললেন—কেমন বেড়াজালে পড়েছিস! চাল খুঁজে পাচ্ছিস না।

সোমনাথ উত্তর দিল না, বোর্ডের ওপর ঝুঁকে একমনে চাল ভাবতে লাগল। একনাথ তীক্ষ্ণচোখে তার পানে চাইলেন, তারপর আফিমের কৌটো তুলে নিয়ে কৌটো খুলে সমস্ত আফিম মুখে দিলেন। কৌটোয় প্রায় দেড় ভরি আফিম ছিল।

একঢোঁক জলের সাহায্যে আফিম গলাধঃকরণ করে একনাথ বিজয়ীর চোখে নাতির পানে চাইলেন, বললেন—তোরা আজকালকার ছোকরা খুবই চালাক-চতুর, কিন্তু আমরা বুড়োরাও বড় কম যাই না, এখনও তোদের হারাতে পারি। ভাল কথা, ডাক্তার আজ একটা ভারী দামী কথা বলেছিল। বলেছিল, যদি আত্মহত্যা না করি, পনেরো কুড়ি বছর

বাঁচব-হাঃ হাঃ হাঃ! এই আংটিটা রাখ, ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি। নিজের আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে তিনি সোমনাথের দিকে এগিয়ে ধরলেন—এই নে।

সোমনাথের তখন কাদের সাপ অবস্থা। সে অন্যমনস্কভাবে আংটি নিয়ে বলল—আংটি—কি হবে?

একনাথ বললেন—ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি—আমার উপহার।

ও—আচ্ছা— আংটি পকেটে রেখে সোমনাথ আবার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ খেলা চলার পর, একনাথ পিছনের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। তাঁর ঘুম আসছে, ঘুমের জোয়ারে তাঁর চেতনা যেন ডুবে যাচ্ছে। সম্মুখে শান্তি পারাবার

দাদু, এবার আপনার চাল।

একনাথ চোখ টেনে টেনে চাইলেন, তারপর উঠে বসে ছকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি গলার মধ্যে হাসির মত একটা শব্দ করলেন, কম্পিত হাতে নিজের মন্ত্রী কোণাচে ভাবে দুঘর এগিয়ে দিয়ে বললেন—কিস্তিমাৎ। দাদু, তুই হেরে গেলি।

একনাথ পিছনের তাকিয়ার ওপর আবার এলিয়ে পড়লেন, আফিমের শুন্য কৌটো হাত থেকে স্খলিত হয়ে বিছানায় পড়ল।

সোমনাথ বোর্ড থেকে চোখ তুলে লজ্জিতভাবে একনাথের পানে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। একনাথের এলিয়ে পড়ার ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়।

সোমনাথ বলে উঠল–দাদু। কী হয়েছ?

একনাথ সাড়া দিলেন না। সোমনাথ তখন উঠে গিয়ে তাঁর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—দাদু! দাদু!

এবারও একনাথের কাছ থেকে সাড়া এল না। সোমনাথ স্তম্ভিতভাবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার চোখ পড়ল আফিমের কৌটোর ওপর। সে সেটা তুলে নিয়ে দেখল, কৌটো শুন্য। সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল–এ আপনি কি করলেন দাদু। তারপর চিৎকার করে উঠল—গোবর-দা, গোবর-দা, শিগগির এস।

গোবর্ধন ছুটে এল। সোমনাথ তাকে ডেকে বলল—যাও শিগগির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। জলদি জলদি! দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!

গোবর্ধন একবার একনাথের পানে চাইল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিতভাবে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে ললিতা।

কুসুম উৎকণ্ঠা ভরা গলায় বলল—কী হয়েছে কী হয়েছে সোমনাথ?

সোমনাথ প্রায় কেঁদে উঠল—মা, সর্বনাশ হয়েছে দাদু—এই দ্যাখো। সে আফিমের শূন্য কৌটো খুলে দেখাল। কুসুম তাই দেখে হু হু শব্দে কেঁদে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বলল—অ্যাঁ! এ কি হল! মা চণ্ডী, তুমি এ কি করলে—!

ললিতা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

.

আধঘণ্টা কেটে গেছে। ঘরে কয়েকটা বড় বড় ল্যাম্প জ্বালা হয়েছে। একনাথের দেহ খাটের ওপর লম্বাভাবে শোয়ানো হয়েছে। গোবর্ধন তাঁর পায়ের ওপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ডাক্তার পাণ্ডে খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চেয়ে আছেন, তাঁর মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। পাশে কুসুম আর ললিতা পরস্পরকে যেন আগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের পায়ের কাছে সোমনাথ, তার চোখে মাঝে মাঝে জল উথলে উঠছে। সে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুচছে। ঘরে এই পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই।

অবশেষে সোমনাথ ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—আমরা যাতে সুখী হই তাই তুমি এভাবে চলে গেলে। দাদু, হেরে গিয়েও তুমি মাথা নীচু করলে না। তুমিই সত্যিকার অভিজাতক। ভগবান তোমায় শান্তি দিন।